স্বস্তিকা

দাম : ষোলো টাকা

৭৫ বর্ষ, ৩৯ সংখ্যা।। ২৯ মে, ২০২৩

১৪ জ্যৈষ্ঠ - ১৪৩০।। যুগাব্দ - ৫১২৫

website : www.eswastika.com

শিবাজীই ভারতে
হিন্দু সমাজের
আলোকবর্তিকা

— পৃঃ ২৬

CENTURYPLY®

CENTURYPLY® CENTURYLAMINATES® CENTURYVENEERS®

CENTURYPRELAM® CENTURYMDF® CENTURYDOORS™

zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS

STARKE
NEW AGE PANELS

SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR

For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৫ বর্ষ ৩৯ সংখ্যা, ১৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

২৯ মে - ২০২৩, যুগাব্দ - ৫১২৫,

Website : www.eswastika.com

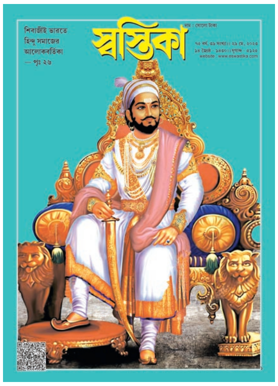

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

‘শিরে কৈলে সর্পাঘাত তাগা বাঁধব কোথা’
◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

দুয়ারে শাড়ি কেন গো দিদি? ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

হিন্দুত্বকে প্রশাসনিকভাবে মদত দিতে স্থানীয় উন্নয়ন প্রকল্পগুলির গুরুত্ব সর্বাগ্রে ◻ স্বপন দাশগুপ্ত ◻ ৮

স্বরাজ্য স্থাপনের ইচ্ছা পুত্রের মাধ্যমে পূর্ণ করেছিলেন জিজামাতা ◻ মৌমিতা বর ◻ ১০

হিন্দুদের মনে জয় করা ইচ্ছে জাগানোর জন্য হিন্দু সাম্রাজ্যদিনোৎসব উদ্‌যাপন ◻ শিবাজী প্রসাদ মণ্ডল ◻ ১৩

স্বরাজ্য স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে সুশাসনও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শিবাজী মহারাজ ◻ দিগন্ত চক্রবর্তী ◻ ১৫

ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রেরণার কেন্দ্রবিন্দুতে ◻ শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী ◻ ১৭

সমলিঙ্গের বিবাহ : আদালত ভারত ভাগ্যবিধাতা নয়
◻ তারক সাহা ◻ ২০

হিন্দু সাম্রাজ্যের উদগাতা ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ
◻ কল্যাণ গৌতম ◻ ২৩

শিবাজীই ভারতে হিন্দুসমাজের আলোকবর্তিকা
◻ ড. জিষ্ণু বসু ◻ ২৬

হিন্দু সাম্রাজ্যদিনোৎসব ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল অধ্যায়
◻ প্রবীর কুমার মিত্র ◻ ৩১

রাষ্ট্রনায়ক ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ ◻ দীপক খাঁ ◻ ৩৩

এই বামপন্থা কোথা হইতে আসিল?
◻ আনন্দ মোহন দাস ◻ ৩৫

লাভ জিহাদ থেকে সতর্ক হতে হবে হিন্দু নারীদের
◻ বটু কৃষ্ণ হালদার ◻ ৩৭

কর্ণাটকে টুকরে টুকরে গ্যাং জেগে উঠেছে
◻ মণীন্দ্রনাথ সাহা ◻ ৪৩

‘দ্য কেরালা স্টোরি’ ধর্মান্তকরণের বীভৎস পরিণতির চিত্র
◻ রঞ্জন কুমার দে ◻ ৪৫

এখন অপেক্ষা ‘বেঙ্গল ট্রুথ’ দেখার ◻ শিতাংশু গুহ ◻ ৪৭

ঐতিহাসিক কোহিনুর হিরা দেশে ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগ মোদী সরকারের ◻ বিশ্বামিত্র ◻ ৪৮

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ◻ **অঙ্গনা** : ২১ ◻ **সুস্বাস্থ্য** : ২২ ◻ **সমাবেশ সমাচার** : ২৮-৩০ ◻ **অন্যরকম** : ৩৯ ◻ **নবাঙ্কুর** : ৪০-৪১ ◻ **সংবাদ প্রতিবেদন** : ৪৯ ◻ **চিত্রকথা** : ৫০

ফঃ ১

প্রকাশিত হবে
৫ জুন, ২০২৩

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রকাশিত হবে
৫ জুন, ২০২৩

তদন্তের মুখোমুখি হতে ভয় কেন?

সম্প্রতি সিবিআই তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য ডেকে পাঠিয়েছিল। তিনি গিয়েওছিলেন। কিন্তু তার আগে জিজ্ঞাসাবাদ এড়ানোর জন্য তিনি অনেক চেষ্টা করেছেন। শুধু অভিষেকই নন, রাজ্যের অনেক নেতা-মন্ত্রীও সিবিআই এবং ইডির সামনাসামনি হতে ভয় পাচ্ছেন। সত্যি তাঁরা যদি নির্দোষই হন তা হলে এত টালবাহানা কেন? সমন এড়ানোর জন্য বারবার আদালতের দ্বারস্থ হচ্ছেন, পছন্দমতো রায় না পেলে আরও উচ্চ আদালতে পৌঁছে যাচ্ছেন। প্রশ্ন উঠছে, আদালতে যাওয়ার এত টাকা আসছে কোথা থেকে? কাদের টাকায় এঁরা আদালতে নামি দামি আইনজীবী নিয়োগ করছেন?

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় এইসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা হবে। লিখবেন— বিমল শঙ্কর নন্দ, ড: রাজলক্ষ্মী বসু প্রমুখ।

দাম ষোলো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,
৮৬৯৭৭৩৫২১৫,
হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION
A/C. No. : **103502000100693**
IFSC Code : **IOBA0001035**
Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK
Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে। এটি এক ধরনের অনুদান মাত্র। সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন এবং আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেকSubhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
Bank A/c --- 103502000100693
IFSC -- IOBA0001035
Bank -- Indian Overseas Bank
Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

হিন্দু হৃদয়সম্রাট

ইসলামি শাসনকালকে ভারতবর্ষের ইতিহাসে অন্ধকার যুগ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। ইসলামি শাসকবর্গের নৃশংস ও বর্বর অত্যাচারে হিন্দুদিগের জীবন নিষ্পেষিত ও লাঞ্ছিত হইতেছিল। সর্বত্র নিরাশার কালোমেঘ ঘনাইয়া আসিয়াছিল। দেশীয় রাজন্যবর্গ ও শাসনকর্তারাও কেহ কেহ স্বীয় ভগিনী অথবা কন্যা সম্প্রদান করিয়া মুঘলদের দাস হইয়া সুখে দিনাতিপাত করিতেছিলেন। সেই ঘোর নিরাশার মধ্যেও রাণা প্রতাপের ন্যায় হিন্দুবীর প্রবল শক্তিধর মুঘলদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়া মরণপণ লড়াই করিয়াছেন। তাঁহার প্রয়াণের পর নিরাশার কালো মেঘ আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল। সেই সময় আবার এক হিন্দুবীরের উত্থান হিন্দুদিগের মনে আশার সঞ্চার করিয়াছিল। তিনি গো ব্রাহ্মণ প্রজাপ্রতিপালক হিন্দবি স্বরাজ্য সংস্থাপক ক্ষত্রিয়কুলভূষণ ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ। তাঁহার উত্থান সমগ্র ভারতবর্ষের পক্ষে আশীর্বাদ স্বরূপ বর্ষিত হইয়াছিল। তিনি সমাজকে দাসত্বের মানসিকতা হইতে মুক্ত করিয়া বিজিগীষু মনোভাবে উজ্জীবিত করিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রের হিন্দুদিগকে তিনি যোদ্ধা জাতিতে পরিণত করিয়া, মুঘলদের নিকট হইতে দুর্গ ছিনাইয়া লইয়া, স্বরাজ্য স্থাপন করিয়া হতাশার পরিবেশ দূরীভূত করিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, শাস্ত্রানুমোদিত রাজ্যাভিষেকের আয়োজন করিয়া মহারাজা উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্যাভিষেক সমগ্র ভারতবর্ষে এক নব আশার সঞ্চার করিয়া হিন্দুদিগের মনে স্বাধীনতার স্পৃহাকে অধিকতর জাগ্রত করিয়াছিল।

তিনি যে স্বরাজ্যের স্বপ্ন দেখিতেন সিংহাসনারূঢ় হইয়া তাহা সাকার করিবার জন্য একটি আদর্শ শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়াছিলেন। রাজ্যের সামগ্রিক বিকাশের জন্য তিনি অষ্টপ্রধান নিয়োগ করিয়া শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করিয়াছেন। শাসনকার্যে তিনি স্ব-ভাষা চালু করিয়াছিলেন। শিবশক পঞ্জিকা চালু করিয়াছিলেন। তাঁহার সেনাবহিনীতে সর্বধর্মের মানুষের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত ছিল। সর্ব ধর্মের প্রতি সমভাব পোষণ করিতেন। জলপথে নজরদারির জন্য নৌবাহিনী নির্মাণ করিয়াছিলেন। আধুনিককালের ঐতিহাসিকরা তাঁহাকে ভারতীয় নৌবাহিনীর জনক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার গেরিলা যুদ্ধনীতি বর্তমান বিশ্বের বহু দেশ তাহাদের রণনীতি হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে। নারীজতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য মুসলমান ঐতিহাসিকরাও তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন। জনকল্যাণ ও সুশাসনের জন্য তিনি ছিলেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তিনি নিজেকে প্রজাসাধারণের প্রতিনিধি মনে করিয়া রাজ্য শাসন করিতেন। বীরত্ব ও সাহসিকতার তিনি ছিলেন মূর্ত প্রতীক। সবচাইতে বড়ো কথা হইল, হিন্দুদিগকে দেশ ও ধর্মরক্ষায় উদ্বুদ্ধ করিয়া এক কুশল রাজনীতিক রূপে পশ্চিম ভারতে তিনি হিন্দু স্বরাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত করিবার জন্য লোকমান্য তিলক প্রমুখ গণপতি উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র দেশে শিবাজী উৎসবের প্রবর্তন করিয়াছিলেন। কলিকাতার উৎসবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া স্বরচিত শিবাজী উৎসব কবিতা পাঠ করিয়াছিলেন। সেই কবিতায় ছত্রে ছত্রে শিবাজী মহারাজের স্তুতি বর্ণিত হইয়াছে। শিবাজী মহারাজের রাজ্যাভিষেকের দিনটিকে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ প্রথমাবধি হিন্দু সাম্রাজ্যদিনোৎসব হিসাবে পালন করিয়া আসিতেছে। তাঁহার রাজ্যভিষেকের তিনশত পঞ্চাশতম বর্ষ উপলক্ষ্যে এই বৎসর উৎসবটি ব্যাপকভাবে পালন করিবার জন্য সমগ্র সমাজের নিকট সঙ্ঘ আবেদন জানাইয়াছে। কেননা দেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে দেশবাসীর নিকট শিবাজী মহারাজার জীবন যেইরূপ প্রেরণার মন্ত্র হইয়া উঠিয়াছিল, বর্তমান সময়েও দেশ ও জাতিগঠনের জন্য তাঁহার জীবন ও কর্ম সমানভাবে প্রাসঙ্গিক ও প্রেরণাদায়ক।

সুভাষিতম্

শঙ্কাভিঃ সর্বমাক্রান্তমন্নং পানং চ ভূতলে।

প্রবৃত্তিঃ কুত্র কর্তব্যা জীবিতব্যং কথং নু বা।।

পৃথিবীতে খাদ্যদ্রব্য ও পানীয় বিপদে পরিপূর্ণ। এরকম পরিস্থিতিতে যদি সব পদার্থই ছেড়ে দিতে হয়, তাহলে বেঁচে থাকা যাবে কীভাবে?

‘শিরে কৈলে সর্পাঘাত তাগা বাঁধব কোথা’

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নতুন ভাবে জেরা শুরু করেছে তদন্ত সংস্থাগুলি। বহু করণকষ্যি আর কোর্টঘর করেও অভিষেকবাবু তা আটকাতে পারেননি। এখন অবধি আইনত তিনি অভিযুক্ত নন। কিন্তু ব্যবহার করছেন দাগি আসামি বা অপরাধীর মতো। পালিয়ে গিয়ে আইন এড়াতে চাইছেন। বাঁচতে গিয়ে ছলাকলা আর দুরভিসন্ধিকে সঙ্গী বানিয়ে ফেলেছেন। তাই আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে আইন প্রক্রিয়াকে পিছিয়ে দেওয়ার প্রতারণা আর সভ্য নাগরিক ব্যবহারের অবমাননা ও একপ্রকার মানসিক বিকারের অভিযোগ উঠেছে। তা অগ্রাহ্য করতে গেলে গণ্ডারের চেয়েও মোটা চামড়ার প্রয়োজন। তাতে গণ্ডার লজ্জা পাবে। নির্লজ্জ আর দু'কান কাটা না হলে এযুগে রাজনীতিক হওয়া যায় না। ব্যতিক্রম নিশ্চয় আছেন। ব্যতিক্রম নিয়ম নয়। আমি এখানে নিয়মের কথা বলছি। ব্যতিক্রমীদের স্থান আলাদা।

অভিষেকবাবু সেই নিয়মের ভিতর পড়েন। যদিও নিজেকে নিয়মের ব্যতিক্রম হিসেবে তুলে ধরেন। স্তাবককুল তাতে মদত দেয়। মূল্যবোধের রাজনীতিক হিসেবে নিজেকে তুলে ধরার অধিকার তাঁর রয়েছে— এই মুহূর্তে সে দাবি আর অধিকার দু'টোই হাস্যকর। আড়ালে আবডালে দলের পুরোনো নেতারা তাঁকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করেন। খেদের সঙ্গে অনেককে বলতে শুনেছি আরশোলা আবার পাখি? অভিষেকবাবুর দাবি প্রথম দফার জেরায় তদন্ত সংস্থা অশ্বডিম্ব প্রসব করেছে। তাঁবেদার সংবাদমাধ্যম সে দাবিকে গ্রাহ্য বলেছে। উপায় নেই। আমি মানতে নারাজ। আদালত যাঁকে প্রতারক বলে তুলে ধরার ব্যাখ্যা দিয়েছেন আমার কাছে তিনি ‘সাসপেক্ট’ বা ‘সন্দেহভাজন’ হয়েই থাকবেন যতদিন সে তকমা তিনি নিজেই মুছে দিতে না পারছেন।

তাঁর এই প্রতারণাকে ‘লৌহ হস্তে দমন’ করার জন্য আদালত নির্দেশ দিয়েছেন। পঁচিশ লক্ষ টাকা জরিমানা করেছেন যাতে তাঁর মতো প্রতারকরা ভবিষ্যতে এই ধরনের অন্যায় কাজে লিপ্ত না হয়। এই রায় যুগান্তকারী আর দৃষ্টান্তমূলক। এটা দুর্ভাগ্যের যে এ রাজ্যের বিরোধী দলগুলি বিচারপতি অমৃতা সিনহার এই রায়কে জনগণের হাতে তুলে দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। আমার মতে এই রায়কে সামনে রেখে আগামীদিনে বিরোধীদের নির্বাচন লড়া উচিত। বিচারপতি সিনহার ২৩ পাতার এই রায়ে বলা হয়েছে তা যে কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তির কাছে চোখ খুলে দেওয়ার মতো।

> **আজ নয়তো কাল অভিষেকবাবু গ্রেপ্তার হতে বাধ্য।... পরিণত রাজনীতিবিদ মমতা জানেন অভিষেকবাবুকে সাপে কেটেছে। সে সাপ অভিষেকের মাথায় দংশন করেছে। তাই তাগা বেঁধে কোনো লাভ হবে না।**

অভিষেকবাবু বা তাঁর দলের নেতা-নেত্রীদের এই রায় থেকে চোখ ফুটবে কি না আমি জানি না কারণ তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারো বছর ধরে তাঁদের চোখ বুজে থাকার শিক্ষা দিয়ে এসেছেন। এই রায় বাতিল করার জন্য অভিষেকবাবু উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন। বাকিটা গা জোয়ারি করে আবার প্রমাণের চেষ্টা করছেন যে তিনি কোনো ভুল করেন না। নতুন তৃণমূলের জনজোয়ার যাত্রাকে টোপ ধরে তিনি তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতি আর অন্যায়ের বৃহত্তর ছবিটাকে ফিকে করার চেষ্টা করছেন। বলার চেষ্টা চালাচ্ছেন তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত চালানো ওই যাত্রাকে আটকাতে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে নয়। দাবিটা ঘোড়ার হাসার মতো।

৩৮ বছরের এক রাজনৈতিক তরুণের কাছ থেকে রাজ্যের মানুষ শিশুসুলভ কথা আশা করেন না। মেঘ যত গর্জায় তত বর্ষায় না। চতুর রাজনীতিক মমতা কিন্তু অভিষেকের ভবিষ্যৎ বুঝে গিয়েছেন। ক্ষমতান্ধ অভিষেকবাবু তাঁর কতটা বুঝতে পেরেছেন আমার সন্দেহ রয়েছে। মমতা আগেভাগেই জানিয়ে রেখেছেন তদন্তে অভিষেক আটকে গেলে তিনি পথে নামবেন। ইঙ্গিতটা স্পষ্ট। আজ নয়তো কাল অভিষেকবাবু গ্রেপ্তার হতে বাধ্য। তাঁর আগামীদিনের পরিণতি সাংঘাতিক। তিনি যতই মিথ্যা আস্ফালন করুন না কেন। পরিণত রাজনীতিবিদ মমতা জানেন অভিষেকবাবুকে সাপে কেটেছে। সে সাপ অভিষেকের মাথায় দংশন করেছে। তাই তাগা বেঁধে কোনো লাভ হবে না। আর ওঝা ডেকেও কোনো লাভ নেই। শিরে কৈলে সর্পাঘাত তাগা বাঁধি কোথা। □

দুয়ারে শাড়ি কেন গো দিদি?

শাড়িপ্রিয়া দিদি,

সত্যই আপনি কথা ভাবেন। আপনাকে কখনও শাড়ি ছাড়া অন্য পোশাকে দেখিওনি। কিন্তু বাংলার নারীদের জন্য আপনি যে এত ভাবেন তা অবশ্য আগে বুঝিনি। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার করেছেন, এবার লক্ষ্মীর শাড়ি।

আপনি ঘোষণা করেছেন, রাজ্যের প্রতি ব্লকে 'বাংলার শাড়ি' দোকান খুলবে আপনার সরকার। কিন্তু আপনার এই ঘোষণায় আশার চেয়ে সংশয় তৈরি হলো বেশি। কারণ, আমি ভাবছি এর পরে আবার শাড়ি কেলেঙ্কারি, শাড়ি দুর্নীতি কত কিছুই না হবে। আপনার ভাইদের তো আর বিশ্বাস নেই।

তবে দিদি আমার মনে অন্য প্রশ্নও রয়েছে। আপনি অপরাধ নেবেন না ভেবেই বলছি, এর কি আদৌ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে? আপনি বলেছেন, এখানে কম দামি শাড়ি পাওয়া যাবে। মানে তিনশো টাকা থেকে শুরু হবে দাম। এই দাবিটিই গোলমেলে লাগছে। কারণ, সরকারি বস্ত্রবিপণি 'তন্তুজ'-এর দোকানগুলিতে মেলে বারো হাত 'জনতা শাড়ি'। যার দাম দেড়শো টাকার কম। তা হলে আপনার নতুন উদ্যোগ আর সস্তা হলো কী করে?

তাছাড়া বছরের বিশেষ বিশেষ সময়ে তন্তুজ, মঞ্জুষা, খাদি-সহ নানা সরকারি বিপণি দামে প্রচুর ছাড় দেয়। অতএব সস্তায় শাড়ি দিতে চাইলে ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত বিপণিগুলিতে আরও কম দামে বিক্রির ব্যবস্থা করতে পারে সরকার, নতুন দোকান খোলা হবে কেন?

আরও একটা প্রশ্ন রয়েছে। জনসাধারণের কাছে কোনও পণ্য সস্তায় দিতে রাজকোষের টাকা তখনই খরচ করা চলে, যখন সেই পণ্যটি উন্নত জীবনধারণের জন্য জরুরি অথচ বাজারে সহজে ও সস্তায় পাওয়া যায় না। অন্ন ও বাসস্থানের মতো বস্ত্রও মানুষের এক মৌলিক প্রয়োজন হলেও সস্তার নামে ঠকানো তো ঠিক নয় দিদি।

আপনি সস্তায় শাড়ি বিক্রির জন্য নতুন দোকান খোলার কথা বলার পর থেকেই ভাবছি, সেগুলো তো কৃত্রিম তন্তু দিয়েই তৈরি হবে, মেশিনে বোনা হবে। বাংলার তাঁতের তাতে উন্নতি হবে কি? শাড়ির উৎপাদন হস্তচালিত তাঁতের জন্য সংরক্ষিত, এই আইন বহাল থাকা সত্ত্বেও সরকার নিজস্ব বিপণিতে যন্ত্রে বোনা শাড়ি বিক্রি করবে না কি?

তবে আপনি তো কিছু না ভেবে কাজ করেন না। বুঝতে পেরেছি। 'তন্তুজ' হস্তচালিত তাঁতিদের সমবায়ের শীর্ষ সংগঠন বলেই আপনি সরকারি উদ্যোগে পাওয়ারলুমে উৎপাদিত পণ্যের বিপণনের জন্য একটি আলাদা 'ব্র্যান্ড' তৈরি করতে চাইছেন। যন্ত্রে বোনা পলিয়েস্টার- মিশ্রিত শাড়ি এখন চলেও বেশি। গ্রাম কেন শহরেও হাতে পয়সা না থাকায় মানুষ সেগুলো কেনেও। কিন্তু তাতে বাংলার তাঁতের কোনও লাভ হয় না। আরও একটা প্রশ্ন, সস্তায় সেই শাড়ি বাজারে পাওয়া গেলে লোকে সরকারি দোকানে যাবে কেন? আর সরকার অপ্রয়োজনে ভরতুকি দেবেই-বা কেন?

পঞ্চায়েত ভোটের আগে এই টোপ। ও বুঝেছি। বলছেন, কিন্তু করবেন না। সেটা ভালো। আর দিদি এই সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও প্রকল্পও নেই। তাতে কেন্দ্রের পয়সায় বাংলার শাড়ি নাম দিয়ে কিছু করাও যাবে না। সুতরাং, আপনি খালি বলেই রাখলেন। করবেন না। বুঝেছি দিদি, বুঝেছি।

আমি মনে করি, সরকারি টাকায় অগ্রাধিকার দরিদ্রের। গরিব মেয়ের কি শাড়ির অভাব ঘটেছে? তা তো হয়নি। তবে পঞ্চায়েত ভোটের আগে এই টোপ কেন? ও বুঝেছি। বলছেন, কিন্তু করবেন না। সেটা ভালো। আর দিদি এই সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও প্রকল্পও নেই। তাতে কেন্দ্রের পয়সায় বাংলার শাড়ি নাম দিয়ে কিছু করাও যাবে না। সুতরাং, আপনি খালি বলেই রাখলেন। করবেন না। বুঝেছি দিদি, বুঝেছি। □

অতিথি কলম

স্বপন দাশগুপ্ত

হিন্দুত্বকে প্রশাসনিকভাবে মদত দিতে স্থানীয় উন্নয়ন প্রকল্পগুলির গুরুত্ব সর্বাগ্রে

সাম্প্রতিক কর্ণাটক নির্বাচনে কংগ্রেসের বড়ো মাত্রার জয়ের ফলশ্রুতি হিসেবে যে সমস্ত বৌদ্ধিক বিচারে ভারতে 'নির্বাচনী স্বৈরতন্ত্র' চলছে বলে ধারণা প্রচার করা হতো সেখানে রাতারাতি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়ে ভারতকে কয়েক ধাপ তুলে 'নির্বাচনী গণতন্ত্র' রয়েছে বলে তকমা দেওয়া হয়েছে। ২০১৪ সাল থেকে যে বৌদ্ধিক ইকোসিস্টেম (একই সুরে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তাল মেলানো) নেহাতই অনাথ হয়ে পড়েছিল আর ২০১৯-এর পর থেকে সামগ্রিক রক্তস্রোতই তেতো হয়ে গিয়েছিল তারা আজ সদ্যোজাত প্রাণীর মতো টগবগে হয়ে মাত্র ১ পয়েন্টের প্রকল্প নিয়ে বুঁদ হয়ে থাকার চিন্তায় মগ্ন— ২০২৪-এ নরেন্দ্র মোদীকে যে কোনো মূল্যে হারাতে হবে।

একথা বলতেই কর্ণাটকের জয় নিশ্চিতভাবে একটি উদ্দীপনার বুস্টার ডোজ দিয়েছে, যারা সেখানে শাসক পরিবর্তন চেয়েছিল। বিগত চার মাসে বিজেপি দুটি রাজ্য সরকারের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে। এরই মধ্যে কংগ্রেস-আপের কাছে পঞ্জাব হারানোর ক্ষতি কিছুটা পুষিয়ে নিয়েছে প্রথমে হিমাচল প্রদেশ জয় এবং তারপর এই কর্ণাটকে বড়ো জয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, ছত্তিশগড়ে অনতিদূরের নির্বাচনগুলি কংগ্রেস ও বিজেপি দুজনের কাছেই মহাগুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচনগুলি এই বছরের নভেম্বর মাসেই হওয়ার কথা। কর্ণাটক নির্বাচনের অন্তিম সপ্তাহটিতে প্রচারের তিক্ততা পারস্পরিক ও জনগণের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়ে উঠছিল। সেই ফর্মুলার প্রয়োগ মনে হয় লোকসভা নির্বাচনের আগামী মাসগুলিতে তার চেয়ে দ্বিগুণ ভয়ংকর হয়ে উঠবে।

দাক্ষিণাত্যের একমাত্র রাজ্যটিতে বিজেপির এই ব্যর্থতা নিশ্চিত ভাবেই দলের অভ্যন্তরে চুলচেরা পদ্ধতিতে বিশ্লেষিত হবে। বিরোধী দলগুলি নিশ্চিতভাবে এই নির্বাচনী ফলাফলকে বিজেপির হিন্দু জাতীয়তাবোধের ক্রমশ ঝকঝকে করে তোলা চেহারাকে সম্পূর্ণ বাতিল করে বরাবরের মতো তাদের জয়ের আশাকে সেই সেকুলারিজমের নিরন্তর প্রচার চালিয়ে যাওয়ার ওপর অসীম গুরুত্ব আরোপ করবে। কিন্তু বিজেপি এক্ষেত্রে একটি সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী সিদ্ধান্তের পথে যাবে। কর্ণাটকের ক্ষেত্রে যে রাজ্যে সরকারের বর্ণহীন মামুলি কাজকর্মের পরিণতিতে বরাবরের বিজেপি অনুরাগীদের হতাশ হয়ে পড়া আটকাতে প্রচারের শেষ মুহূর্তে গৈরিক সাফল্যের খতিয়ান প্রচার করাটা নিশ্চিত প্ল্যান অনুযায়ী করা হয়েছিল। যাতে হতাশ সমর্থকদের চাঙ্গা করা যায়। পুনরায় দলের দিকে মনোযোগী করা যায়। এমন একটা সম্পূর্ণ বিরোধী পরিবেশে গতবারের ৩৬ শতাংশ ভোট ধরে রাখা আদৌ ছোটোখাটো ব্যাপার নয়। আর এর একমাত্র কারণ হচ্ছে শেষ পর্যায়ের প্রচারের তীব্র আবেগপূর্ণ দিকটি।

দলের সামগ্রিক আদর্শগত দিকটিকে একেবারে প্রচারের শেষদিকে সম্পূর্ণ তীব্রমাত্রায় জনগণের কাছে তুলে ধরা বর্তমান বিজেপির একটা প্রচলিত রীতি ও এক অর্থে কৌশল হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদিও উত্তরপ্রদেশ ও গুজরাটের ক্ষেত্রে সামাজিক উন্নয়ন, প্রকল্পের সাফল্য ও রাজ্য প্রশাসনের সাফল্যকে প্রথমেই তুলে আনতে দেখা গেছে। কিন্তু কর্ণাটকের ক্ষেত্রে এই সাফল্যের খতিয়ান সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। কারণ চল্লিশ শতাংশ কমিশন দেওয়া নিয়ে সরকারের ভাবমূর্তির ওপর যে কালিমা লেপন করার তীব্র প্রচার চলে তার কিছুটা প্রতিক্রিয়া নিশ্চিত হয়েছে। একই সঙ্গে রাজ্য থেকে মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য জনপ্রিয় কোনো মুখকে তুলে ধরার অভাবও ভোটারদের উৎসাহিত করতে পারেনি। অন্যদিকে এ রাজ্যে কংগ্রেসের দীর্ঘদিনের জানা চেনা মুখ অনেক ছিল। বিজেপির গ্রহণযোগ্য মুখের অভাবের পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেসের এই সুবিধে তাদের প্রতিশ্রুত বিপুল খরচার জনগণকে দেওয়া চারটি গ্যারান্টি সাময়িকভাবে মানুষকে আকর্ষিত করেছে। অবশ্য বাস্তবে যদি সরকার এই প্রতিশ্রুতিগুলিকে সঠিকভাবে পালন করে তাহলে রাজ্যের অর্থভাণ্ডারের দেউলিয়া হয়ে যেতে সময় লাগবে না।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে হিন্দুদের সংহতি। তাদের একসূত্রে বাঁধা সবসময় কেবলমাত্র উগ্র হিন্দুত্বের ডাকে সফল হয়নি। এর মাধ্যমে সরকারে অধিষ্ঠিত হলেও মানুষের উন্নয়নকারী প্রকল্পগুলির রূপায়ণ ও সামগ্রিক প্রশাসনের ওপর উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ থাকা দরকার। এখানে শৈথিল্যের ফল ভালো নয়। কর্ণাটকে এই বিষয়গুলির ঘাটতি ছিল। যে কারণে নির্বাচনী খেলার স্লগ ওভারে হিন্দুত্বের সর্বময় প্রচার সংখ্যালঘুদের কংগ্রেসের দিকে একত্রিত করে দেয়। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও হিন্দু একতায় আদৌ টাল খায়নি, তারা আগেরবারের সংখ্যাতেই জোটবদ্ধ থেকেছে।

ভাগ্যের খেলায় এখান থেকেও ২০২৪-এর ভোটে ভালো রসদ পেতেই হবে। প্রধানমন্ত্রীর নিজস্ব উজ্জ্বল ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা যা এই নির্বাচনেও বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়েছে এবং বিজেপি সরকারের গর্ব করার মতো বহু উন্নয়নের কাজ রয়েছে। রয়েছে সাফল্যমণ্ডিত বহু জনগণের মঙ্গলসূচক পরিকল্পনা। একই সঙ্গে এই সাফল্যগুলিকে যথাযথভাবে জনগণের নজরে আনার মতো প্রচার পরিকল্পনাও চলছে। এরই বিপরীতে বিরোধী দলগুলি তাদের উপযুক্ত পরিচালকশূন্য এবং ভবিষ্যৎ দিশাহীন। কর্ণাটক জেতাই সব নয়, সারা ভারতব্যাপী কংগ্রেসের বৌদ্ধিক নেতাদের কেবলমাত্র জাতপাত নিয়ে এধার ওধার করলেই হবে না বা নিজেদের কাছেই দুর্বোধ্য 'আইডিয়া অব ইন্ডিয়া'-কে মানুষের কাছে স্বচ্ছ করতে হবে। একই সঙ্গে রয়েছে এক আজব বহুদলীয় রাজনৈতিক

একতার কথা। এগুলি এই জন্যই তাদের অবশ্যকর্তব্য যে ভারতের মানুষের মধ্যে একটি সর্বব্যাপী সাধারণ ধারণা তৈরি হয়েছে যে ভারত পরিচালনার শিখরে মোদী রয়েছেন এবং তিনি সর্বোচ্চ পদে থাকলেই ভারত নিরাপদ ও সুরক্ষিত থাকবে।

কংগ্রেস দল যারা কর্ণাটক ফলাফলের আগে পর্যন্ত একটি অস্তিত্ব রক্ষার সমস্যা নিয়ে ছটফট করছিল এখন নতুন পরিস্থিতিতে অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার সমীকরণ সম্পূর্ণ নতুন চেহারা নেবে। লক্ষণীয়, এবারে ভোটে দল ভোটে লড়ে জিতেছিল একটি শক্রপোক্ত স্থানীয় নেতৃত্ব বজায় থাকায়। এবং যারা সর্বদা নানা ধরনের স্থানীয় বিষয় নিয়ে প্রোগ্রাম করত। গান্ধী পরিবার যে থেকে থেকেই কর্ণাটক যাতায়াত করত তা এটা বোঝাতেই যে তারাই সর্বোপরি বা মূল কর্ণধার। বাস্তবে কর্ণাটকে স্থানীয় নেতারা তাদের নিজস্ব কার্যকর্তাদের নিয়ে একটি কিয়দংশে প্রাদেশিক দল হিসেবেই বিজেপির সঙ্গে লড়েছে। এরই বিপরীতে বিজেপি দ্বৈত ইঞ্জিনের মাধ্যমে প্রশাসন পরিচালনার যে তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছে তার সঙ্গে রাজ্যের স্থানীয় সমস্যার প্রতি আলাদা নজর এবং সেখানে মানুষের মনোমতো নেতৃত্ব যেন প্রতিষ্ঠিত হয় তার দিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল। কর্ণাটকে এই বাধ্যবাধকতাগুলির অভাব ছিল।

ঠিকভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে বিজেপির বেশ কিছু প্রাদেশিক দক্ষ নেতৃত্ব আছেন যোগী আদিত্যনাথ, হিমন্ত বিশ্বশর্মা, শিবরাজ সিংহ চৌহান, বসুন্ধরা রাজে, ইয়েদুরাপ্পা, দেবেন্দ্র ফড়নবীশ যাদের মধ্যে অন্যতম। কিন্তু এঁরা ছাড়া দলের আরও অনেক স্থানীয় নেতৃত্বের মধ্যে সেই কর্তৃত্ব করার সহজাত ক্ষমতা ও নিজস্ব গণ আবেদন যাকে বলে তার অভাব রয়েছে। অনেক রাজ্যে জনগণের মধ্যে পর্যাপ্ত জনপ্রিয়তা ও সমর্থন আছে এমন নেতা থাকলেও সেখানে দলের দীর্ঘদিনের এক ধরনের নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে আবদ্ধ সংগঠনের পারস্পরিক বোঝাপড়ার অভাব দেখা যাচ্ছে। লোকসভা নির্বাচনের ক্ষেত্রে এই সব গুরুত্বপূর্ণ ফাঁকফোকর সাধারণত ভরাট হয়ে যায় নরেন্দ্র মোদীর গগনচুম্বী জনপ্রিয়তা ও তাঁর ওপর অসীম আস্থা থাকার ফলে। এখানে মোদী অনেকটাই প্রেসিডেন্ট ইলেকশানের ধারায় বহু অবিশ্বাস্য ভোট নিজের দিকে টেনে নেন।

কিন্তু বর্তমানে রাজ্যে নির্বাচনগুলিও অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের চেহারা নিচ্ছে এবং সেখানে দৃঢ় ও সব ধরনের কৌশলে শক্তিশালী দলগুলির সঙ্গে মোলাকাতে বিজেপি অনেক ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় স্তরে শক্তিধর হলেও রাজ্যস্তরে তা প্রতিফলিত করতে পারছে না। এক সাইজের জামা সকলেরই ফিট করে যাবে এমন ধরে এগোলে অনেক সময়ই নির্দিষ্ট রাজ্য থেকে সেখানকার সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞানহীন হওয়ার দায় আসবে। এর সমাধান হিসেবে রাজ্য নেতৃত্বকে বর্ধিত ক্ষমতা দান এবং রাজ্য ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মধ্যে বোঝাপড়া ও পারস্পরিক নির্ভরতা সমানতালে না বাড়লে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক রাজনীতি তীব্রতর হয়ে উঠবে।▯

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদ শেষ হয়েছে বা শেষ হতে চলেছে তাঁদের কাছে বিনীত নিবেদন, আপনারা পরবর্তী বছরের জন্য গ্রাহকমূল্য ৭০০ টাকা অবিলম্বে জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণের মাধ্যমে আমাদের সহযোগিতা করুন। স্বস্তিকার প্রতিনিধির মাধ্যমেও টাকা পাঠাতে পারেন।

নতুন গ্রাহক হলে সম্পূর্ণ নাম-ঠিকানা, ফোন নম্বর (পিন কোড সহ) অবশ্যই পাঠাবেন।

ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

শোকসংবাদ

হাওড়া মহানগরের বর্ষীয়ান স্বয়ংসেবক ও বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী দিলীপ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১৮ এপ্রিল পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। তিনি এক সময় অবিভক্ত হাওড়ার জেলা কার্যবাহ ছাড়াও অধিবক্তা পরিষদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। স্বয়ংসেবক পরিচালিত অধুনালুপ্ত 'শিবপুর শিক্ষালয়'-এ শিক্ষকতাও করেছেন। শেষে পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের শিবপুর শাখার সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। হাওড়া কোর্টে আইনজীবীদের নাটক-সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কাজকর্মে সক্রিয় ছিলেন। তিনি তাঁর আইনজীবী পুত্র, পুত্রবধূ, কন্যা ও অন্যান্য পরিজনদের রেখে গেছেন।

* * *

মালদা জেলার বৈষ্ণবনগর খণ্ডের স্বয়ংসেবক অনুপম দাস ও নবীন দাসের পিতৃদেব বৈদ্যনাথ দাস গত ২৯ এপ্রিল পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ১০৩ বছর। তিনি তার সহধর্মিণী, ৩ পুত্র, ৩ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, অনুপম দাস মণ্ডল কার্যবাহের দায়িত্ব পালন করেছেন এবং নবীন দাস বর্তমানে উত্তরবঙ্গ প্রান্ত ধর্মজাগরণ সমন্বয়ের প্রান্ত প্রশাসনিক প্রমুখের দায়িত্ব পালন করছেন।

* * *

উত্তর দিনাজপুর জেলার হরিরামপুর শাখার স্বয়ংসেবক তথা তৎকালীন পশ্চিম দিনাজপুর জেলার পূর্বতন জেলা কার্যবাহ এবং রায়গঞ্জ সারদা বিদ্যামন্দিরের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক অরূপ কুমার সরকারের মাতৃদেবী বরুণা সরকার গত ২০ মে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর।

* * *

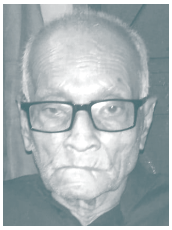

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মধ্যবঙ্গ প্রান্তের পরিবার প্রবোধনের প্রান্ত সংযোজক সুব্রত সামন্তের পিতৃদেব হলধর সামন্ত গত ১৮ মে পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর গ্রামের বাড়িতে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৫ বছর। তিনি ৪ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন।

স্বরাজ্য স্থাপনের ইচ্ছা পুত্রের মাধ্যমে পূর্ণ করেছিলেন জিজামাতা

মৌমিতা বর

ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি নারী আর একজন নারীর পরিপূর্ণতা তার মাতৃত্বে নিহিত। এই মাতৃত্বই হলো মনের সর্বোচ্চ প্রেমাবস্থা। মাতৃত্ব মানে সন্তানের কল্যাণে নিবেদিত প্রাণ। মাতৃত্ব শুধু সন্তানের জন্ম দেওয়া নয়। এটি শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিগত ও আধ্যাত্মিক স্তরের পুনর্নবীকরণ। আমাদের সন্তানদের মধ্যে দৈবীভাব প্রকাশিত হোক, তার জন্য প্রচেষ্টা করা হলো মাতৃত্ব।

স্বামীজীর ভাষায়— 'ভারতের জননীই আদর্শ নারী। মাতৃভাবই ইহার শেষ কথা— ভারতে নারীর আদর্শ মাতৃত্ব। সেই অপূর্ব, স্বার্থ শূন্য, সর্বংসহা, নিত্য ক্ষমাশীল জননী। মাতৃত্বই নারীকে পূর্ণ করে, মাতৃত্বই নারীর নারীত্ব।' (ভারতের নারী, স্বামীজীর বাণী ও রচনা (৫ম খণ্ড), পৃ. ৩৩৫-৩৩৭)। স্বামীজী তাঁর 'ভারতের নারী' প্রবন্ধে পাশ্চাত্য নারীর কালেজি শিক্ষা বা বিদ্যাবত্তা থেকেও মাতৃত্বের দায়িত্ববোধকে অধিক গুরুত্ব দান করেছেন। তাঁর মতে ভারতই হলো একমাত্র ভূমি, যেখানে কোনো মা সন্তান লাভের পূর্বে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন এবং ঈশ্বরের মতোই কল্যাণময় এক সত্তাকে সন্তান রূপে কামনা করেন। এমনই এক ভারতীয় মাতা ছিলেন জিজামাতা, যিনি গর্ভবতী অবস্থায় নিত্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছেন, যাতে তিনি এমন এক সুপুত্রের জন্ম দিতে পারেন, যিনি হিন্দু সমাজের সকল প্রকার গ্লানি দূর করে হিন্দু স্বরাজ্য স্থাপন করবেন।

বৈদেশিক আক্রমণে ভারতবর্ষে হিন্দু সমাজ যখন সর্বপ্রকার গ্লানিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল, এমন সময়ে অমাবস্যার কালো রাতে চাঁদের মতো আনন্দদায়ক এক কন্যার জন্ম চন্দ্রবংশের যাদব বংশে হয়। তিনি জিজাবাঈ। তাঁর জন্মের শুভ দিনটি ছিল পৌষ পূর্ণিমা, পুষ্য নক্ষত্র (শ্রীরামচন্দ্রের জন্মনক্ষত্র), বৃহস্পতিবার, শকাব্দ-১৫১৮ অর্থাৎ ১২ জানুয়ারি ১৫৯৮ খ্রিস্টাব্দ। বিদর্ভের বুলঢানা জেলার মেহকর তহসিলের সিন্দখেড় রাজা নামক গ্রামে তাঁর জন্ম। তাঁর মা ছিলেন মহালসাবাঈ এবং বাবা লাখোজিরাও যাদব। মা-বাবা মানত করেছিলেন যাতে মেয়ে হয়। স্বাভাবিকভাবেই তিনি বড়ো হয়েছেন খুবই আদরের সঙ্গে।

পূর্ণিমার দিন হলো পূর্ণ চন্দ্রমার দিন। ওইদিন আকাশে যেমন চাঁদকে তার সমস্ত কলা নিয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে দেখা যায়, তেমনি এই মেয়েটি ক্ষত্রিয়ের সমস্ত গুণ নিয়ে পূর্ণিমার দিনে জন্মেছিল। যার কারণে বাড়িটি আনন্দে ভরে ওঠেছিল। জিজা ছিলেন তার বাবা লাখোজির বড়ো আদরের। সে সবসময় তার বাবার চারপাশে খেলা করত। বুদ্ধিমান সর্দারদের সঙ্গে কথাবার্তা চললে বাবার কোলে বসে চুপচাপ শুনত। মাঝে মাঝে অনেক গম্ভীর প্রশ্ন করত। বাবাও তাকে বোঝাতেন। অল্প বয়সে সর্দার, অশ্বদল, মনসবদার, গোটমুখের মতো বিভিন্ন শব্দ তার পরিচিত ছিল। তার বুদ্ধিমত্তা, পাণ্ডিত্য দিনে দিনে বাড়তে থাকে।

সে সময় মুঘল শাসকের অত্যাচার চরমে পৌঁছেছিল। 'মাতৃবৎ পরদারেষু' সংস্কারের দেশে মা-বোনেরা সুরক্ষিত ছিল না। দিবালোকে অপহরণের মতো ঘটনা ঘটত, সম্মানহানি করা হতো। হিন্দুদের শ্রদ্ধার কেন্দ্রগুলিকে ধ্বংস করা হতো। হিন্দুদের দৃষ্টিভঙ্গি উপেক্ষা করাটাই যেন ছিল মুসলমানদের জীবনের লক্ষ্য। আর হিন্দুরা নীরব হয়ে তা দেখত, সহ্য করত। দেশে শৌর্য ছিল, বীরত্ব ছিল, তবুও মানুষ মানসিকভাবে দাস ছিল। এটা শৈশবে জিজাবাঈয়ের মনকে গভীরভাবে আহত করেছিল। একদিন তিনি তাঁর সহেলির সঙ্গে বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন। শিব মন্দিরের দেওয়ালে একজন মুঘলকে মূত্রত্যাগ করতে দেখে তাঁর ভ্রূ কুঞ্চিত হলো। উত্তেজিত হয়ে তিনি পরিবারের সদস্যদের কাছে অভিযোগ করলেও সবাই চুপ করে থাকেন। একজন বয়স্ক ব্যক্তি বললেন, 'বাছা

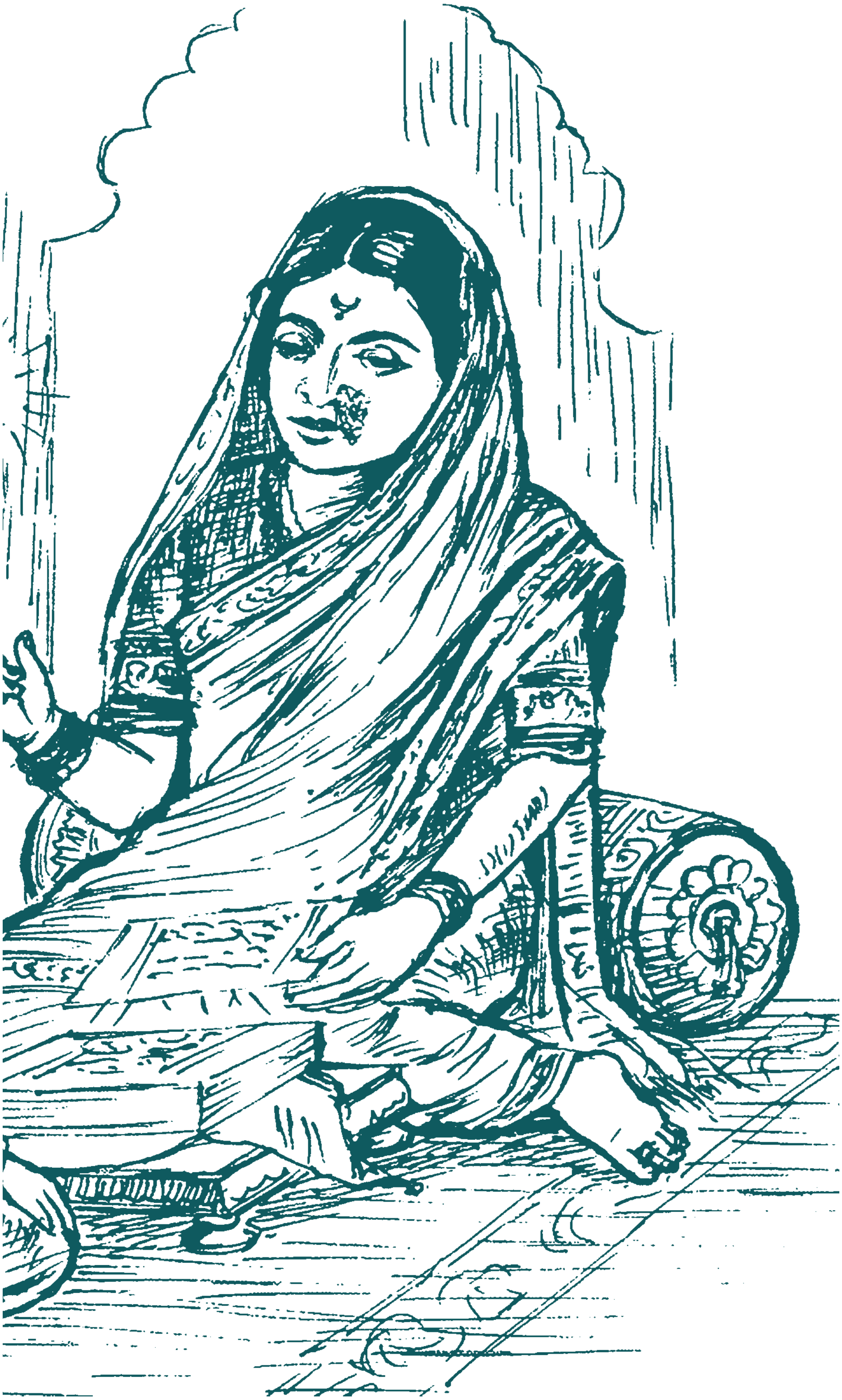

ওরা মুসলমান, শাসকদের লোক। আমরা ওদের কিছু বলতে পারব না।' জিজাবাঈ কষ্ট পেতে থাকেন— 'আমরা কি পূজ্য দেবতাদের অপমান সহ্য করতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি? আমাদের মধ্যে কি আর বীরত্ব নেই? না, আমি এসব সহ্য করব না। আমি পরিস্থিতির পরিবর্তন করব।' ভেতরে প্রতিকারের স্ফুলিঙ্গ জ্বলছিল।

যথাসময়ে তাঁর বিয়ে হয় শাহজীরাজে ভোঁসলের সঙ্গে। তিনি আদিলশাহের জায়গিরদার ছিলেন। তিনি পরাক্রমশালী হলেও দাস ছিলেন। আদিলশাহের দরবারে বাবা ও ভাইয়ের হত্যা, জা-খেলজির স্ত্রীকে নিয়ে যাওয়ার ইত্যাদি ঘটনার জন্য প্রতিদিন ভবানী মায়ের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন, 'মা, আমাকে একটি সুপুত্র দাও।' 'দেবী শিবাই, তুমি আমাকে এমন একটি পুত্র দাও, যে রাষ্ট্রধর্ম তথা সমাজের উদ্ধারক হবে। পৃথিবীতে শিবত্বের বসন্ত বয়ে আনবে, ন্যায়-নীতির আশ্রয়ে সকলে শান্তিতে ঘুমাতে পারবে।' এই রূপ চিন্তা করতে করতে জিজাবাঈয়ের গর্ভ দিনে দিনে বাড়তে থাকে। তিনি তাঁর সমস্ত ইচ্ছাশক্তি, আবেগ গর্ভস্থ সন্তানের উপর নিবদ্ধ করেছিলেন। জিজার মনে অধর্মনাশের জন্য লাভা ফুটছিল, ধর্মের প্রকাশের তথা হিন্দুত্বের পুনরুত্থানের সংকল্প করতেন প্রতিক্ষণ। শিবাইকে দর্শন করতে যাওয়ার সময় মনে মনে নিজেদের অঞ্চলকে নিজেদের অধিকারে আনার ভাবনায় মগ্ন থাকতেন। ফলস্বরূপ গর্ভে জন্ম নেওয়া শিশুও বিজিগীষু মনোভাবের হয়েছিল।

১৫৫১ শকাব্দের ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণ তৃতীয়ার (১৯ ফেব্রুয়ারি ১৬৩০) জিজামাতা শুভ সংস্কারে ওতপ্রোত একটি সন্তানের জন্ম দেন। যেন কৃষ্ণপক্ষে জন্ম নিয়ে তিনি জানান দিচ্ছেন, দাসত্বের কৃষ্ণরাত্রির অবসান হবে, স্বরাজ্যের নতুন বছর শুরু হবে। শিবাই দেবীর সান্নিধ্যে, তাঁর কৃপায় জন্ম নেওয়া শিশুটির নাম রাখা হয় শিবাজী।

শিবাজীকে লালন পালন করার সময় জিজামাতা খুব সতর্ক থাকতেন। তখনকার দিনে শিশুর জন্য দুধ-মা বা সেবিকা রাখার রীতি ছিল। কিন্তু জিজামাতা সেটা মেনে নেননি। মাতৃদুগ্ধ বিনা শিশুর জীবন হীনমন্যতা ও দাসত্বে পরিপূর্ণ হোক তা তিনি চাননি। কৌশলের মাধ্যমে কীভাবে কঠিন পরিস্থিতিতেও পথ বের করা যায়, কীভাবে শ্রীকৃষ্ণ গোকুলে গোপালকদের একটি দল তৈরি করে গোরু পালনপোষণ করেন, গুরুর প্রতি শ্রীরামের মনে কতটা বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ছিল, নতমস্তক হতে হলে গুরুজীর সামনে, মা ভবানীর সামনে হব, বিধর্মীদের সামনে নয়— ছেলের মন এইসকল ভাবনা দিয়ে ভরিয়ে দিতে থাকলেন জিজামাতা।

জিজাবাঈ ও শিবাজী কিছু সময়ের জন্য ব্যাঙ্গালোরে থাকতে যান। একদিন শিবাজী দেখলেন, একজন কসাই একটা গোরুকে মারতে তার পিছন পিছন ছুটছে। তিনি সহ্য করতে না পেরে দৃঢ়তার সঙ্গে তাকে থামালেন ও গোরুটিকে বাঁচালেন। একবার নিজের শরীরের গয়না দিয়ে একটি গোরু উদ্ধার

ফঃ ২

করেন। মায়ের সংস্কার শিবাজীকে চুপ থাকতে দেয়নি।

জিজামাতা শিবাজীকে রাজা হিসেবে নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন। রাজা প্রজাদের নায়ক ও সেবক দুই-ই। তাঁর মধ্যে কিছু বিশেষ গুণ বা বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক বলে মনে করে তাঁকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। শিবাজী সকল প্রকার শাস্ত্রজ্ঞান লাভের পাশাপাশি হাতি, ঘোড়া ও রথে চড়া, তলোয়ার, ধনুক, চক্র, বর্শা, চাবুক ইত্যাদির দ্বারা যুদ্ধ করা, মল্লযুদ্ধ, দুর্গম দুর্গে প্রবেশ করা, দুর্গম স্থান থেকে লুকিয়ে বেরিয়ে যাওয়া, লক্ষ্য ভেদ করা, মানুষের মনের গভীরে পৌঁছানো, যত্ন নেওয়া, বিষ উদ্গীরণ, বিভিন্ন ধরনের রত্ন পরীক্ষা ইত্যাদি বিষয় ছাড়াও শাস্ত্র ও কলাবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন। বিদ্যার্জনের পাশাপাশি জিজামাতা পুত্রের মধ্যে সহজ-সরল ব্যক্তিত্ব, আত্মসম্মানবোধ, সাধু-মহাত্মাদের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব নির্মাণ করেন। সেনাবাহিনীতে মাদকদ্রব্য নিষিদ্ধ করা এবং কোনো নারীরই যাতে অপমান না হয়, এবিষয়ে সচেষ্ট থাকা--- এটা জিজামাতারই শিক্ষা।

যুদ্ধের জন্য মাওলে অঞ্চল এবং সেখানে বসবাসকারী, শক্তিশালী, কৃষ্ণবর্ণীয় মাওলেরা শিবাজীর সঙ্গী হয়ে ওঠেন। নেতা ও তাঁর সঙ্গীরা যদি মিলেমিশে ঐক্যবদ্ধ হন, তবেই তাঁরা কিছু গড়তে পারবে। সেজন্য জিজামাতা মাওলেদেরও নিজের কাছে ডাকতেন। তাদেরও বিভিন্ন গল্প শোনাতেন। জীজামাতা এটা অনুভব করেছিলেন যে, তাঁর পুত্র কখনোই একা একা যুদ্ধ করতে পারবে না। তাই শিবাজীর জীবনে এমন কিছু বন্ধুর প্রয়োজন, যাঁরা তাঁর স্বপ্নকে বুঝবে, তাঁকে সমর্থন করবে এবং তাঁর স্বপ্নপূরণে সহযোগী হবে। মাওলেরা ছিলেন শিবাজীর বন্ধু, আত্মীয়। এরা সকলে তার সমতুল্য নয়, তাই শিবাজী যেন তাদের সঙ্গে খেলা না করেন, সেরকম চিন্তা জিজামাতা কখনোই মাথায় আসতে দেননি। আর সেজন্যই সুঁচ যেমন সুতোর সাহায্যে কাপড়ের টুকরোকে জোড়ে, তেমনি মাওলেরাও শিবাজীকে অনুসরণ করতে থাকে এবং স্বরাজ্যরূপী বস্ত্র প্রস্তুত করতে থাকে। পরিণামস্বরূপ ১৫৬৫ সালে মাত্র ১৫ বছর বয়সে শিবাজী রোহিদেশ্বরে হিন্দু স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠার সংকল্প করেন। অঙ্গুলের রক্ত দিয়ে দেবতার অভিষেক করেন এবং খেলতে খেলতে তোরণা দুর্গ দখল করে গৈরিক পতাকা উত্তোলন করেন। অবাস্তব মনে করা স্বরাজ্যের স্থাপনার কাজ একজন মা নিজের ১৫ বছর বয়সি কিশোর পুত্রের মাধ্যমে সাকার করে দেখিয়েছিলেন।

মা তাঁকে খেলাধুলা করতেও অনুপ্রাণিত করতেন। একবার শিবাজী ও জিজামাতা চৌসর খেলছিলেন। শিবাজী জিজ্ঞেস করলেন— মা, কী শর্ত রাখবে? মা সামনের জানালা থেকে কোণ্ডানা দুর্গের ওপর সবুজ পতাকা উড়তে দেখতে পান। বিধর্মী, অত্যাচারী ক্ষমতার চিহ্ন। মা বললেন, 'আমি জিতলে, সামনে যে পতাকা উড়ছে, তার জায়গায় গৈরিক পতাকা উত্তোলন করতে হবে।' এবং আমরা জানি বীর শিবাজী ১৬৪৭ সালে বাপুজী মুগ্দল নাম্হেকরের সহায়তায় কোণ্ডানা দুর্গ জয় করেছিলেন।

বিভিন্ন কারণে যখন যখন শিবাজী মহারাজ হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন, তাঁর মা তাঁকে বিভিন্নভাবে সঠিক পথে এগিয়ে যেতে উৎসাহ দিয়েছেন। পুনেতে আসার পর জিজামাতা প্রথম থেকেই ন্যায়বিচারের কাজ করতেন। শিবাজীর উপস্থিতিতে বা অনুপস্থিতিতে তিনি শাসন ব্যবস্থা দেখাশোনা করতেন এবং প্রয়োজন অনুসারে তাতে কিছু পরিবর্তনও আনতেন।

বজাজী নিম্বালকরের শুদ্ধীকরণ একটি মহান বিপ্লবের সূচক। বজাজী নিম্বালকরের ধর্মান্তরণের ঘটনায় বিচলিত না হয়ে জিজামাতা তাঁর শুদ্ধীকরণ করে একটি নতুন পথ প্রশস্ত করে যেন বিধর্মীশক্তির পা কেটে ফেললেন। একদিকে পুত্র যুদ্ধক্ষেত্রে বিজাপুরকরদের পরাজিত করতে থাকেন, অন্যদিকে মা ধর্মীয় দিক থেকে তাদের পরাজিত করেন। জিজামাতার এই কর্তৃত্বশক্তি অতুলনীয়। জিজামাতা স্বরাজ্য রক্ষার জন্য শিবাজীকে ২৫ লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন। স্বরাজ্য মন্দিরের স্থায়িত্বের জন্য যেন মা তাঁর পাথেয়স্বরূপ আশীর্বাদ পুত্রের ঝুলিতে প্রদান করেন।

মায়ের অনুপ্রেরণা ও উপযুক্ত শিক্ষায় স্বরাজ্যের ভিত দৃঢ় হয়। অনেক প্রতিকূলতা ও বিপত্তি অতিক্রম করে, ক্রমাগত নিজের সৌভাগ্য এবং নিজের ছেলেকে ঝুঁকিতে ফেলে জিজামাতা স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠার খেলায় শেষ পর্যন্ত বিজয়িনী হয়েছেন। হিন্দু-ধর্মযুদ্ধের যজ্ঞবেদিতে তিনি নিজের গার্হস্থ্য সুখকে হবি রূপে আহুতি দিয়েছেন। ইতিহাস তাঁকে বীরমাতা, রাজমাতা প্রভৃতি গৌরবপূর্ণ উপাধিতে ভূষিত করেছে।

স্বাভাবিকভাবেই শিবাজী মহারাজ হিন্দুদের হৃদয় সম্রাট বা দেবতা হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু শিবাজীর দেবতা ছিলেন তাঁর মা জিজাবাঈ। মা ছেলের ভালোবাসা ছিল অসাধারণ। তাদের পরস্পরের জীবনের এতটাই মিল যে, একজনের উল্লেখ না করে অন্যজনের বিষয়ে লেখা অসম্ভব। জিজামাতা ও শিবাজীর সম্মিলিত প্রয়াসই হিন্দু স্বরাজ্যের মহাবস্ত্র বুনেছিল। জিজামাতাকে 'শুভঙ্কর শিবাজী'র দিব্যশক্তি বলে মনে করা হয়। তিনি ছিলেন শিবাজীর সারাংশ। তিনি তাঁর মা, গুরু, প্রেরিকা শক্তি, আধারশক্তি এবং তত্ত্বচিন্তক ছিলেন। জিজামাতার প্রচণ্ড ধর্মপ্রেম, অদম্য ইচ্ছাশক্তি, অসীম দেশপ্রেমের দ্বারাই শিবাজীর কর্তৃত্বশক্তির মূল পরিপুষ্ট হয়েছে এবং তার থেকে হিন্দু সাম্রাজ্যরূপী বৃক্ষ বিকশিত ও সমৃদ্ধ হয়েছে।

শিবাজীর রাজ্যাভিষেক দেখে, আনন্দবনভুবনের নির্মাণ দেখে তার দ্বাদশতম দিনে জ্যৈষ্ঠ কৃষ্ণ নবমী তিথি (শকাব্দ-১৫৯৬) অর্থাৎ ১৬৭৪ খ্রিস্টাব্দের ১৭ জুন রাজমাতা জিজাবাঈ সন্তুষ্ট চিত্তে অনন্তে বিলীন হন। ওইদিন কেবল শিবাজী নন, সমগ্র হিন্দুরাজ্য মাতৃহীন হয়। ইতিহাসের পাতায় আমরা জিজামাতার উল্লেখ মাতুশ্রী জিজাবাঈ, জিজাউ, আউসাহেব, রাষ্ট্রমাতা ইত্যাদি উপাধির সঙ্গে পাই। তাঁর রন্ধ্র রন্ধ্র ছিল মাতৃত্বের গুণে পরিপূর্ণ। তিনি হিন্দুদের মনে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে 'সর্বজনহিতায় সর্বজনসুখায়' হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। তাই তো বলা হয়— 'In one word, she had the head of a man over the shoulders of a woman she remained a guide, philosopher and friend to Shivaji throughout her life. She anxiously watched the rising sun of the glory of the son and was fortunate to witness its climax in the form of his coronation as an independent king and an ornament of kshatriya race.' সোচ্চার কণ্ঠে বলতে পারি, আজ যদি জিজামাতা না থাকতেন, তাহলে আমরা নব যুগের পথপ্রদর্শক শিবাজীকে পেতাম না। না থাকত হিন্দু ধর্ম-সংস্কৃতির নিদর্শন, না দেখা যেত উঠোনে তুলসীগাছ, না অবশিষ্ট থাকত মন্দিরের কলস, না জাগত হিন্দুদের অস্মিতা, না জাগত রাষ্ট্রের প্রতি সমর্পণভাব। □

হিন্দুদের মনে জয় করার ইচ্ছে জাগানোর জন্য হিন্দু সাম্রাজ্য দিনোৎসব উদ্‌যাপন

শিবাজী প্রসাদ মণ্ডল

জ্যৈষ্ঠ শুক্ল ত্রয়োদশী তিথিতে ১৬৭৪ খ্রিস্টাব্দে ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের রাজ্যাভিষেক হয়েছিল মহারাষ্ট্রের পুণার নিকটবর্তী রায়গড়ে। এ বছর সেই ঐতিহাসিক রাজ্যাভিষেকের ৩৪৯ বছর। ভারতবর্ষের ইতিহাসে বহু রাজার রাজ্যাভিষেক হয়েছে কিন্তু তার মধ্যে শিবাজী মহারাজের রাজ্যাভিষেক সম্পূর্ণ পৃথক এবং খুবই প্রেরণাদায়ী। প্রেরণাদায়ী এই জন্যই যে সে সময়ের ভারতবর্ষের পরাধীনতায় শৃঙ্খলিত মুক্তিকামী জাতির কাছে ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ ছিলেন আশার আলো।

সম্পদে, বিদ্যায়, পরাক্রমে, আধ্যাত্মিকতার উচ্চ শিখরে অবস্থানকারী এই প্রাচীন হিন্দু জাতি প্রায় হাজার বছর ধরে অবিরত সংগ্রাম করে চলেছে বিদেশি আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে— তুর্কি, মুঘলদের সঙ্গে প্রায় আটশো বছর এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে দুশো বছরের লড়াই। সর্বশেষ লড়াইটি ছিল কঠিন— যাদের সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যেত না অর্থাৎ পৃথিবীর সর্বপেক্ষা সেই শক্তিশালী জাতি ইংরেজদের বিরুদ্ধে। বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে পরিণত হয়েছিল, মেকলীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় 'কালো ব্রিটিশ' তৈরির অপচেষ্টায় তারা অনেকাংশে সফল এবং পরাণুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষী ও দাসসুলভ দুর্বলতায় আচ্ছন্ন জাতিকে জাগ্রত করতে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কাছে প্রেরণাপুরুষ ছিলেন ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ।

বালগঙ্গাধর তিলক যিনি রাজনীতিতে চরমপন্থী এবং আপাদমস্তক পূর্ণ স্বরাজে বিশ্বাসী ছিলেন তিনি জনসাধারণের মধ্যে দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ, বীরত্ব, সংস্কৃতির প্রতি স্বাভিমান জাগ্রত করার জন্য 'শিবাজী উৎসব' প্রচলন করলেন। ব্রিটিশের প্রচণ্ড বিরোধিতা সত্ত্বেও প্রথম উৎসবটি সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয় ১৮৯৫ সালের ১৫ মার্চ রায়গড়ে। দুই দিনের এই উৎসবে মানুষের উৎসাহ ছিল প্রচণ্ড এবং শুধু মহারাষ্ট্র নয় ভারতবর্ষের দিকে দিকে এই 'শিবাজী উৎসব' ছড়িয়ে পড়েছিল। এই বঙ্গপ্রদেশে স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে শিবাজী উৎসব উন্মাদনার সৃষ্টি করেছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিখ্যাত 'শিবাজী উৎসব' কবিতায় লিখলেন, 'মারাঠির সঙ্গে আজি, হে বাঙ্গালি, এক সঙ্গে চলো মহোৎসবে সাজি। আজি এক সভাতলে ভারতের পশ্চিম-পূরব, দক্ষিণ ও বামে, একত্রে করুক ভোগ এক সঙ্গে একটি গৌরব এক পুণ্য নামে।'

বিদেশি শাসকরা, সে মুঘল হোক বা ইংরেজ এবং তাদের পোষ্য ঐতিহাসিকরা শিবাজী এবং তাঁর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও আদর্শকে ছোটো করে, হীনভাবে দেখাবার চেষ্টা করেছে। এর প্রতিবাদে গর্জে উঠেছিলেন রবীন্দ্রনাথ— 'বিদেশির ইতিবৃত্ত দস্যু বলি করে পরিহাস অট্টহাস্যরবে, 'তব পুণ্য চেষ্টা যত তস্করের নিষ্ফল প্রয়াস এইখানে সবে।' এই বিকৃত, মিথ্যা ইতিহাসের সমাপ্তি ঘটবে এবং সত্য একদিন উদ্‌ঘাটিত হবেই তার আভাস আজ আমরা বর্তমান সময়ে উপলব্ধি করছি, সেটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত বছর পূর্বে ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'অয়ি ইতিবৃত্ত কথা, ক্ষান্ত কর মুখর ভাষণ ওগো মিথ্যাময়ী, তোমার লিখন পরে বিধানের অব্যর্থ লিখন হবে আজি জয়ী।'

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ তার আবশ্যিক পালনীয় ছয়টি উৎসবের মধ্যে এই জ্যৈষ্ঠ শুক্ল ত্রয়োদশী তিথিতে শিবাজী মহারাজের রাজ্যাভিষেক উৎসবকে রেখেছে। যার নাম দেওয়া হয়েছে হিন্দু সাম্রাজ্য দিনোৎসব। বস্তুত এই দিনেই হিন্দু সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়েছিল শিবাজী মহারাজের সাহস, পরাক্রম, চারিত্রিক দৃঢ়তা ও বুদ্ধিমত্তার দ্বারা। আগামী প্রজন্ম যাতে তাঁর জীবন থেকে প্রেরণা নিয়ে রাষ্ট্রের উত্থানে ব্রতী হয় তাই এই উৎসব অবশ্য পালনীয়।

পৃথিবী বিখ্যাত মহান সমরকুশলীদের পাশে একাসনে শিবাজী মহারাজকে বসানো যায়; একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে এর থেকে একটু

বেশিই মর্যাদা দেওয়া যায়। তার কারণ ছত্রপতি শিবাজীর সামর্থ্য ছিল সামান্য। একজন জায়গিরদারের পুত্র ছিলেন তিনি। আলেকজান্ডার বা নেপোলিয়নের মতো বিপুল সৈন্যসম্ভার, গোলা, বারুদ, ধনসম্পদের রসদ শিবাজীর ছিল না। দক্ষ, সাহসী মাওয়ালি যুবকদের নিয়ে ছোট্ট সেনাবাহিনী গঠন এবং পুরনো ভাঙা দু' একটা কেল্লা জয়ের দ্বারা তিনি অভিযান শুরু করেছিলেন। তবে সামর্থ্য যত স্বল্পই হোক না কেন লক্ষ্য ছিল বৃহৎ। ছোট্ট বয়সেই মা ভবানীর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন স্বাধীন হিন্দু সাম্রাজ্য গঠনের জন্য স্বরাজ প্রতিষ্ঠার। 'শিবাজী উৎসব' কবিতায় রবীন্দ্রনাথের ভাষায়— 'এক ধর্মরাজ্য পাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত বেঁধে দিব আমি।' সামান্য পঞ্চাশ বছরের জীবনকালে যতটাই করতে পেরেছিলেন তা ছিল শূন্য থেকে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির সমান এবং এটাই শিবাজী মহারাজের মহত্ত্ব।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার বার বার শিবাজী মহারাজের জীবন অধ্যয়ন ও অনুসরণের কথা বলেছেন। সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার সময়কালে সাধারণ মানুষ যেমন নিজেকে হিন্দু বলতে ভয় ও সংকোচ বোধ করত এবং ভারতবর্ষ যে হিন্দুরাষ্ট্র তা ছিল কল্পনার অতীত। ঠিক একইরকম শিবাজী মহারাজের সময়কালে বিদেশি বিধর্মীর শাসনের অবসান করে স্বরাজ প্রতিষ্ঠাও ছিল অকল্পনীয়। সকলে মনে করত শুধু দাসত্বই তাঁদের বিধিলিপি। শুধু সাধারণ মানুষ নয়, সমাজের পণ্ডিত ও বিদগ্ধজন, আজকের ভাষায় যাঁদের বুদ্ধিজীবী বলা হয়, তারা বলতেন দিল্লীশ্বরই জগদীশ্বর। অন্যদিকে রাজপুত ও মারাঠা সর্দাররা তাদের প্রবল পরাক্রম ভুলে গিয়ে স্বাভিমানশূন্য হয়ে পদ প্রতিষ্ঠার লোভে সুলতান, মোঘলদের অধীনে দাসত্ব করতেই ভালোবাসতো।

শিবাজী মহারাজের বাবা শাহজী ভোঁসলে যিনি বিজাপুর সুলতানের অধীনে একজন সামান্য জায়গিরদার ছিলেন। তিনিও ভাবতেন শিবাজীও তার মতো একজন জায়গিরদার হবেন এবং বিজাপুর সুলতানের একজন রাজকর্মচারী হবে। কিন্তু শিবাজীর জীবন প্রভাতের কিছু ঘটনা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল যে রাজকর্মচারী নয়, এই যুবক রাজটীকার অধিকারী। রাজদরবারের ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচয় করানোর জন্য শাহজী বালক শিবাজীকে বিজাপুর নিয়ে যাচ্ছেন; পথমধ্যে এক কসাইকে গোহত্যা করতে দেখে শিবাজী ঘোড়া থেকে নেমে তাঁর হাত কেটে ফেললেন, ঘটনার আকস্মিকতায় সবাই অবাক হয়েছিলেন। বিজাপুর দরবারে শাহজী মাথা ঝুঁকিয়ে বার বার সুলতানকে কুর্নিশ করতে বললেও শিবাজী বুকটান করে দাঁড়িয়ে রইলেন; শত আদেশ, অনুরোধ তাঁর মাথা নোয়াতে পারেনি। এই সাহস, চারিত্রিক দৃঢ়তা আগামীর দিনের আভাস দিয়েছিল। ধর্ম, সংস্কৃতি ও স্বদেশের প্রতি এত ভালোবাসা ও স্বাভিমানবোধের পেছনে যার সব থেকে বেশি অবদান ছিল তিনি মাতা জিজাবাই। তিনি চোখের সামনে মুঘল সুলতানদের সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচার দেখেছিলেন। বিশেষত হিন্দু মা, বোনদের চরম সম্মানহানি তার বুকের মধ্যে যে যন্ত্রণার উদ্রেক করেছিল তা শিবাজীর হৃদয়ে তিনি আগুন রূপে সঞ্চারিত করেছিলেন। প্রথম জীবনে পিতা, পরবর্তীকালে স্বামী শাহজীকে স্বরাজের কথা বললেও জিজাবাই তাঁদের কাছ থেকে শুধু অসহায়তার কথাই শুনেছিলেন। তৎকালীন পরিস্থিতি এমনই ছিল। প্রত্যেকেরই ধারণা এই ছিল যে হিন্দু বীরেরা মুসলমান শাসকদের অধীনে জায়গিরদার, সেনাপতি, বড়োজোর মন্ত্রী হতে পারেন, কিন্তু স্বাধীন রাজা বা সম্রাট কখনোই হতে পারেন না; এ কল্পনার অতীত। তৎকালীন পরিস্থিতি বর্ণনা করতে গিয়ে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার বলছেন— 'অতীতে মুসলমান শাসনের বিরুদ্ধে কোনো বিরোধিতাই শেষ পর্যন্ত টেকেনি। এমনকী স্বাধীনতার স্মৃতি কিংবা ঐতিহ্য, সাধারণভাবে বলতে গেলে, হিন্দুদের মন থেকে একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল; হিন্দুরা তখন দিল্লির মুসলমান শাসককে মর্ত্যভূমির দেবতা হিসেবে পূজা করতে শুরু করেছিল। এই অত্যাচার তারা অলস উদাসীনতার সঙ্গে গ্রহণ করে নিয়েছিল এই জন্য যে বহুদিন বিদেশি শাসনের অধীনে অবস্থান এবং মুক্তির জন্য অতীত প্রচেষ্টাগুলোর বিহ্বলতা তাদের পৌরুষ, শক্তি, দেশাত্ববোধ এবং জাতীয়তাবোধ সম্পূর্ণ নষ্ট করে দিয়েছিল। শিবাজীর মহত্ত্ব এই জন্য যে তিনি নীরব দর্শক বা অলস ভাবুকের ভূমিকাতে থাকতে রাজি ছিলেন না। দেশকে মুক্ত করবার ধারণাটা তার মনের মধ্যে ধীরে ধীরে এবং অবিরামভাবে জাগ্রত হয়ে উঠেছিল। ভারতের ইতিহাসে বৈদেশিক আক্রমণের বিরুদ্ধে দেশের রাজা এবং জনসাধারণ বীরত্বের সঙ্গে এদেশকে রক্ষা করেছেন এমন দৃষ্টান্ত আমরা বহু পাই। কিন্তু হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষে এমন আর একজন হিন্দু বীরের সাক্ষাৎ আমরা পাই না যিনি এই প্রকার স্থির সংকল্প নিয়ে দেশকে এবং ধর্মকে বিদেশি শাসন এবং পীড়ন থেকে রক্ষা করতে এগিয়ে এসেছেন।'

ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ দেশ ও ধর্মকে বিদেশি শাসন থেকে রক্ষা করতে এগিয়ে এসেছিলেন শুধু নয়, তার লক্ষ্য ছিল— স্বাধীন হিন্দু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা। পরিস্থিতি যতই নিরাশাজনক হোক না কেন, সামর্থ্য যতই সামান্য হোক না কেন, পৌরুষ ও পরাক্রমের উপর ভর করে অভীষ্ট লাভ করেছিলেন এবং সমগ্র ভারতবর্ষে বাকি সকল হিন্দু বীরের সামনে প্রেরণা, আশা ও উদাহরণ সৃষ্টি করেছিলেন।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উৎসবগুলির মধ্যে বর্ষপ্রতিপদ, শ্রীগুরুপূর্ণিমা, রাখিবন্ধন, বিজয়াদশমী, মকরসংক্রান্তি— এই পাঁচটি উৎসব সকলের পরিচিত তার সামাজিক মান্যতা আছে; কিন্তু শিবাজী মহারাজের রাজ্যাভিষেক দিবসকে হিন্দু সাম্রাজ্য দিবস হিসেবে পালন করা এক অভিনব বিষয়। যে কোনো উৎসব মানে একত্রিত হওয়া, আনন্দ করা, হইচই করা নয়; তার অন্তর্নিহিত ভাবকে জাগ্রত করা; সমাজের সামনে তার বার্তাকে পৌঁছে দেওয়াই একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। হিন্দু ধর্ম, সংস্কৃতির প্রতি স্বাভিমানবোধ জাগ্রত করা, বিষম পরিস্থিতির মধ্যে সাহসের সঙ্গে বিজয় প্রাপ্তির অনুকূল রণকৌশল অবলম্বন করা এবং সর্বোপরি স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠা করাই শিবাজীর লক্ষ্য ছিল এবং তা তিনি করে দেখিয়েছেন।

সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তারজী শিবাজীর জীবনের এই ভাব ও দৃষ্টান্ত সমগ্র হিন্দু জাতির সামনে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন যাতে স্বাধীন ভারতবর্ষ পরম বৈভবের শিখরে আরোহণ করে এবং সংগঠিত হিন্দুজাতির মধ্যে এক বিজিগীষু মনোভাব জাগ্রত হয়। □

স্বরাজ্য স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে সুশাসনেরও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শিবাজী মহারাজ

দিগন্ত চক্রবর্তী

পৃথিবীর ইতিহাসে বৃহৎ সাম্রাজ্যের উত্থান পতনের দৃষ্টান্তের অভাব নেই। বহু সাম্রাজ্য তৈরি হয়েছে, বেড়ে উঠেছে আবার তাদের স্বৈরাচারী স্বরূপের কারণে বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে মুছে গেছে মানুষের স্মৃতি থেকেও। কিন্তু ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ যে শাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন তা ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে আছে। আজও তা মানুষের কাছে বন্দিত।

ভারতের মাটিতে শিবাজীর যখন আবির্ভাব হয় তখন ভারতবর্ষ জুড়ে অন্ধকার পরিস্থিতি। ভারতবাসী তখন পরাধীন। বিধর্মী মুঘল শাসকদের হাতে লাঞ্ছিত, অপমানিত। তাদের ভয়ংকর অত্যাচার, ধর্মান্তকরণ, নারীদের উপর অত্যাচারে মানুষ তখন ভীত, আতঙ্কিত। গ্রামের পর গ্রাম তখন লুট করে পুড়িয়ে ফেলা হচ্ছে। হিন্দুদের মন্দিরগুলোকে অপবিত্র করে ফেলা হচ্ছে। দাক্ষিণাত্যে তখন মুঘলদের আক্রমণে ধ্বংস হচ্ছে মঠ-মন্দির শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। অপরদিকে শক্তিশালী বিজয়নগর সাম্রাজ্যেরও পতন হয়েছে। সেই সময়ে হিন্দু রাজাদের মধ্যে কোনো ঐক্য ছিল না। ঔরঙ্গজেব হিন্দুদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করে ব্যাপকভাবে মন্দির ধ্বংস, জিজিয়া করের প্রত্যাবর্তন ও হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করছিলেন। হাতেগোনা কয়েকজন বিধর্মী শাসকের এই নৃশংসতার বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে রুখে দাঁড়ানোর তখন কেউ ছিল না। ঠিক সেই সময়ে আশার আলো হয়ে ওঠেন ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ। ভারতবর্ষের বাইরের পৃথিবী যখন নিত্যনতুন বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনের মাধ্যমে দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে, ইউরোপ দারিদ্র্য ও ধর্মীয় উন্মাদনা থেকে বের হতে শুরু করেছে তখন ভারতবর্ষ তমসাচ্ছন্ন। ভারতবর্ষে মুসলমান শাসকদের দ্বারা তক্ষশীলা, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস হওয়ার পর দীর্ঘকাল মুঘল শাসকদের দ্বারা একটিও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়নি। মুঘল শাসকের জন্য একই সঙ্গে হিন্দু ধর্ম ও ভারতবর্ষের গৌরবময় জ্ঞানচর্চার চূড়ান্ত অবনতি হচ্ছিল। অন্যদিকে পর্তুগিজ, ইংরেজ, ডাচ-সহ বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতি বাণিজ্যের অজুহাতে ভারতবর্ষ উপনিবেশ স্থাপনের জন্য মুখিয়ে ছিল।

শিবাজী মহারাজের রাজ্যাভিষেক কেবল শিবাজী মহারাজের পক্ষে বিজয়ের বিষয় নয়। শিবাজীর রাজ্যাভিষেকের সঙ্গে সঙ্গে

অপশাসনের সমাপ্তি ঘটে এবং সূচনা হয় সুশাসনের। দৃঢ় সংগঠক, কুশল যোদ্ধা, ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি হিসেবে শিবাজী ও তাঁর শাসন ব্যবস্থা যথেষ্ট স্মরণীয়। মুঘল আমলের একজন সাধারণ জায়গিরদারের পুত্র হয়েও নিজের প্রচেষ্টায়, নিজের যোগ্যতায় তিনি স্বরাজ্য স্থাপন করেন। মারাঠা সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা শিবাজীর এই শাসন ব্যবস্থা জনকল্যাণের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। মুঘলদের সীমাহীন অত্যাচারের ফলে শাসন ব্যবস্থার উপর থেকে যখন মানুষের আস্থা উঠে গিয়েছিল, ঠিক সেই সময় হিন্দুত্বের আদর্শ মেনে জনকল্যাণকামী সুশাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন শিবাজী মহারাজ।

মুঘল শাসনের আগেও ভারত বিদেশি আক্রমণের শিকার হয়েছিল। কিন্তু মুঘল আমলের মতো নৃশংসতা, বর্বরতার সম্মুখীন এর আগে ভারতবাসীকে কখনো হতে হয়নি। এই আগ্রাসনকারীদের হাত থেকে ভারতীয় সমাজে বিদ্যমান সহনশীলতা, শান্তি ও অহিংসার দর্শনকে রক্ষা করা এবং এই ধর্ম-ধ্বংসকারীদের পরাভূত করার প্রায় পাঁচশো বছরের প্রচেষ্টার এক সফল উপায় শিবাজী মহারাজের রাজ্যাভিষেকের মাধ্যমে সূচিত হয়েছিল। শিবাজী মহারাজের উদ্যম দেখার পরে সকলেই নিশ্চিত হয়েছিলেন যে যদি এরকম কোনও ব্যক্তি থাকেন যার নেতৃত্বে হিন্দু সমাজ, হিন্দুধর্ম, সংস্কৃতি পুনরায় অগ্রগতির পথে এগিয়ে যেতে পারে, তবে তিনি আর কেউ নন, ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ। শিবাজী মহারাজ যে তাঁর ব্যক্তিগত খ্যাতি, সম্মানের জন্য ক্ষমতা দখল করতে চাননি তার প্রমাণ রয়েছে বহু। যখন ছত্রশাল দেশসেবার জন্য তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করতে এসেছিলেন, তখন শিবাজী তাকে বলেছিলেন, 'আপনি কারো চাকর কেন হবেন? ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ করে অন্য রাজার সেবা কেন করবেন? আপনার নিজের রাজত্ব তৈরি করুন।' শিবাজী স্বার্থপরতার দ্বারা বশীভূত হলে কখনোই এরকম কথা বলতেন না। সমস্ত ছোটো রাজ্যগুলোকে গ্রাস করে আরও বড়ো রাজা হওয়া শিবাজীর উদ্দেশ্য ছিল না।

সুষ্ঠুভাবে রাজ্য পরিচালনার জন্য প্রাচীন হিন্দু রাজাদের ঐতিহ্য অনুসরণ করে শিবাজী অষ্টপ্রধান মণ্ডল তৈরি করেছিলেন। যার মধ্যে একজন পেশোয়া বা মুখ্যপ্রধান, একজন ছিলেন হিসাব-রক্ষক বা মজুমদার বা অমাত্য। একজন সেনাপতি, আধ্যাত্মিক প্রধান বা পণ্ডিতরাও, একজন ন্যায়াধীশ, একজন মন্ত্রী ও সচিব ছিলেন। এছাড়াও একজন ছিলেন সুমন্ত অর্থাৎ পররাজ্য সচিব। সেই সময় রাজকার্যে ফার্সি ভাষায় চল থাকলেও শিবাজী রাজকার্য পরিচালনার কাজে মরাঠি ভাষার প্রচলন শুরু করেন। তার এই অষ্টপ্রধানের মধ্যে সেনাপতি ছাড়া আর সকলেই ব্রাহ্মণ হলেও দোনাধ্যক্ষ ও ন্যায়াধীশ ছাড়া) বাকি পাঁচজনই অনেক সময় সৈন্যদলের নেতা হয়ে যুদ্ধেও যেতেন। ফরমান, দানপত্র, সন্ধিপত্র প্রভৃতি বড়ো বড়ো সরকারি কাগজে প্রথমে রাজার মোহর, তারপর পেশোয়ার মোহর এবং নীচে অমাত্য, সচিব, মন্ত্রী, সুমন্ত— এই চার প্রধানের স্বাক্ষর থাকতো।

সরকারি কর্মচারী নিয়োগের দায়িত্ব শিবাজী নিজের হাতে রেখেছিলেন। এই ব্যাপারে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সচেতন। সামন্ত প্রভুদের ক্ষমতা খর্ব করার জন্য তিনি বংশানুক্রমিকভাবে জায়গির প্রথা তুলে দেন এবং জেলায় জেলায় সরকারি কর্মচারী নিয়োগ করেন। সরকারি কাজ যাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় এবং ক্ষমতার অপব্যবহার যাতে না ঘটে সেই জন্য এই নিয়োগগুলোকে তিনি বদলিযোগ্য করেছিলেন।

শিবাজী শাসনকার্য পরিচালনার সুবিধার্থে তার রাজ্যকে কয়েকটি প্রান্ত বা প্রদেশে বিভক্ত করেছিলেন। তিনি তার রাজ্যকে মোট ১৪টি প্রান্তে বিভক্ত করেছিলেন। প্রত্যেকটি প্রদেশ একটি শাসনকর্তার অধীনে পরিচালিত হতো এবং সেই শাসনকর্তাকে নিয়োগ করতেন শিবাজী স্বয়ং। আবার প্রান্তগুলি বিভক্ত ছিল কয়েকটি পরগনায়। শিবাজীর শাসনকালে সমস্ত জমি জরিপ করে তার ৩০ শতাংশ ফসল রাজকর হিসেবে গ্রহণ করতেন। শস্য অথবা নগদ অর্থের মাধ্যমে রাজস্ব দিতে হতো। মুঘল আমলে রাজস্ব দিতে না পারলে যে সীমাহীন অত্যাচারের সম্মুখীন হতে হতো, শিবাজীর আমলে কিন্তু তার নিরসন ঘটেছিল। চাষিদের সাহায্যের জন্য তিনি ঋণ প্রদান পর্যন্ত করতেন।

শিবাজী মহারাজ তৎকালীন সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় যে কোনো রকমের পরিবর্তন করতে পিছপা হননি। তিনি নেতাজী পালকর, বজাজী নিম্বালকারকে স্বধর্মে ফিরিয়ে এনেছিলেন। শুধু তাই নয়, সমাজ যেন তাদের পুনরায় গ্রহণ করে, তার জন্য তাঁদের সঙ্গে পারিবারিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। ঔরঙ্গজেবের সমকালীন ঐতিহাসিক কাফি খানের মতে, শিবাজী কোনোদিন কোনো মসজিদ ক্ষতিগ্রস্ত করেননি। এমনকী কোথাও মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ উদ্ধার করলে তা মুসলমান সৈনিকদের হাতে তুলে দিতেন। কারণ হিন্দুধর্ম কখনো কোনো ধর্মকে আঘাত করতে বলে না। হিন্দু ধর্ম সবসময় বলে স্বধর্ম পালন করতে এবং অপর ধর্মকে সম্মান করতে। আর তাইতো যে ধর্ম শত বছর ধরে ভারতের মন্দির ধ্বংস করেছে, ভারতীয় নারীদের উপর অত্যাচার করেছে, তাদের ধর্মগ্রন্থকেও শিবাজী সযত্নে, সম্মানের সঙ্গে তুলে রাখতেন। শিবাজী মহিলাদের প্রতি সম্মানজনক ব্যবহার করতেন আর কেউ সম্মানহানি করলে তার জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতেন।

শিবাজী মহারাজের ৫০ বছরের জীবনকাল কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে হিন্দুজাতির আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে ব্যয়িত হয়েছিল। তিনি মুঘলদের অনবরত যুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত করে, ভারতবর্ষে তাদের গুরুত্ব কমিয়ে দিতে পেরেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই অবস্থার অপূর্ব বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর 'শিবাজী উৎসব' কবিতায়—

'তার পরে শূন্য হলো ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ নিবিড়
নিশীথে দিল্লিরাজশালা।
একে একে কক্ষে কক্ষে অন্ধকারে
লাগিল মিশিতে দীপালোকমালা।
শবলুব্ধ গৃধ্রদের ঊর্ধ্বস্বর বীভৎস
চীৎকারে মুঘলমহিমা
রচিল শ্মশানশয্যা—মুষ্টিমেয়
ভস্মরেখাকারে হলো তার সীমা।'

ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ ছিলেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রেরণার কেন্দ্রবিন্দুতে

শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী

১৯০৬ সাল। ভারত তখন ব্রিটিশ শাসনাধীন। দেশের রাজধানী কলকাতা। গঙ্গার তীরে কলকাতা টাউন হলে একটি সভার প্রস্তুতি চলছে। আয়োজক জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের কর্তাব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ। তাঁর ডাকে সুদূর মহারাষ্ট্র থেকে প্রধান অতিথি হিসেবে আসছেন এক দেশবরেণ্য স্বাধীনতা সংগ্রামী। তখনও অতিথি এসে পৌঁছাননি। সকলেই অপেক্ষমান। এমন সময় বাইরে কোলাহল। এই বুঝি এসে পড়েছেন তিনি। চারিদিকে স্লোগান উঠলো— বন্দে মাতরম্ শিবাজী মহারাজ কী জয়। দেখা গেল বেশ কিছুটা দূরে গঙ্গার তীর ধরে একটি টাঙ্গা এগিয়ে আসছে। তার উপর বসে এক রাশভারী প্রৌঢ়। মোটা গোঁফ, মাথায় পাগড়ি, কপালে তিলক। হঠাৎ থেমে গেল টাঙ্গা। থেমে গেল বন্দে মাতরম্ ধ্বনি। চারিদিকে গুঞ্জন। কী হলো? সরকার বাদাদুরের সেপাইরা কি পথ আটকেছে? অনুষ্ঠান কি তবে পণ্ড হবে? চমক ভাঙলো অনতিবিলম্বেই। কয়েকজন বাঙ্গালি যুবক টাঙ্গা থামিয়ে ঘোড়া দুটিকে সরিয়ে নিজেরাই টানতে শুরু করেছে টাঙ্গা। স্বস্তির নিঃশ্বাস। আবার উচ্চকণ্ঠে ধ্বনি 'শিবাজী মহারাজ কী জয়।' টাঙ্গা এসে থামল টাউন হলের সামনে। এগিয়ে এলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। টাঙ্গা থেকে নামতেই উষ্ণ অভিবাদনে আপ্লুত অতিথি। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ধীর পদক্ষেপে প্রবেশ করলেন সভা মঞ্চে। সভাগৃহ তখন বন্দে মাতরম্, শিবাজী মহারাজ কী জয়, তিলকজী স্বাগতম্ ধ্বনিতে কান পাতা দায়।

এবার নিশ্চয়ই বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না অতিথিটি কে? সেদিনের সেই অতিথি হলেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রবাদপ্রতিম লাল-বাল-পালের অন্যতম মহানায়ক বালগঙ্গাধর তিলক। যিনি সমগ্র ভারতবর্ষকে ছত্রপতি শিবাজীর দেশপ্রেমের আদর্শে দীক্ষিত করেছিলেন। আর যে সভাটি সেদিন রবীন্দ্রনাথের ডাকে কলকাতার টাউনহলে সংগঠিত হয়েছিল সেটি হলো, শিবাজী উৎসব।

অবাক লাগছে? বর্তমানের প্রেক্ষিতে বাঙ্গলার মাটিতে বালগঙ্গাধর তিলক, শিবাজী, কেমন যেন বহিরাগত বহিরাগত লাগছে না? আজকের দিনে দাঁড়িয়ে কোনো এক রবীন্দ্রনাথ যদি কলকাতার কোনো এক সভাগৃহে শিবাজী উৎসব পালন করতে চান, আর তার প্রধান অতিথি হিসেবে মহারাষ্ট্রের কোনো এক তিলককে ডেকে আনেন, তবে 'জয় বাংলা' স্লোগান দেওয়া বাঙ্গালি সত্তার হোলসেলাররা রে রে করে তেড়ে আসবে না? বহিরাগত অবাঙ্গালির দল বাঙ্গলার কৃষ্টি সংস্কৃতি ধ্বংস করে দিচ্ছে এই অভিযোগে বাঙ্গলার তথাকথিত বুদ্ধিজীবীর দল এ রাজ্যের আকাশ বাতাস ভরিয়ে দেবে না? না, সেদিন রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ কিন্তু শিবাজীকে এবং শিবাজী উৎসবের স্রষ্টা তিলককে বহিরাগত বলে মনে করেননি। অবশ্য দুধে-ভাতে থাকা বাঙ্গালি বুদ্ধিবেচার দল রবীন্দ্রনাথকে আদৌ বাঙ্গলার মনীষী বলে ভাবে কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। নিশ্চয়ই মনে হবে, এমন প্রশ্ন কেন? কারণ সেদিন কলকাতার টাউন হলে রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে তিলকের সভাপতিত্বে যে শিবাজী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে ছিল রবিকবির শিবাজী সম্বন্ধে দার্শনিক অনুভব। যা তিনি স্বহস্তে লিখে এনেছিলেন সভায়। কী ছিল সেই কবিতা?

'কোন দূর শতাব্দের কোন এক অখ্যাত দিবসে
নাহি জানি আজি
মারাঠার কোন শৈলে অরণ্যের অন্ধকারে বসি
হে রাজা শিবাজী
তব ভাল উদ্ভাসিয়া এ ভাবনা তড়িৎ প্রবাহবৎ
এসেছিল নামি
এক ধর্মরাজ্যপাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত
বেঁধে দিব আমি।'

ধর্মরাজ্য? ভারতে? সে কী! ভারতে বিদেশি অত্যাচারী মুঘল শাসনের অবসান ঘটিয়ে হিন্দু ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার কথা রবীন্দ্রনাথের কবিতার উপজীব্য? এ তো চরম সাম্প্রদায়িকতার কথা? রবীন্দ্রনাথ বলেছেন? না এখানেই শেষ নয়। বাঙ্গালি ও মরাঠি সত্তার সংমিশ্রণে এদেশে ইংরেজ শাসনের অবসানের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ছিল তার এই কবিতায়। কবিতার শেষ অংশ আরও আশ্চর্যের—

'ধ্বজা করি উড়াইব গৈরিকের উত্তরি বসন
দরিদ্রের বল
এক ধর্মরাজ্য হবে এ ভারতে এ মহাবচন
করিব সম্বল
মারাঠির সাথে আজি হে বাঙ্গালি এক কণ্ঠে বল
জয়তু শিবাজী
মারাঠির সাথে আজি হে বাঙ্গালি একসঙ্গে চলো
মহোৎসবের সাজি।'

রবীন্দ্রনাথ এইসব লিখেছিলেন নাকি? সেদিন সভায় পড়েও ছিলেন? ভারতে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চাওয়ার কথা বলা রবীন্দ্রনাথ তবে তো বড়ো সাম্প্রদায়িক হে! তার ওপর আবার বাঙ্গালির সঙ্গে মারাঠির একসঙ্গে চলা, একসঙ্গে উৎসবে শামিল হওয়ার কথা বলা— এ তো বাঙ্গালি সত্তার চরম অপমান। না না, আমরা রবীন্দ্রনাথের এহেন আচরণকে তীব্র ধিক্কার জানাই। রবীন্দ্রনাথ নিপাত যাক।— না না এ আমার মুখের কথা নয়। এ হলো নব্য বাংলার জয়বাংলা বলা চ্যালাচামুণ্ডাদের অন্তরের কথা। কিন্তু মনে যাই থাক, সে কথা তো আর সর্বসমক্ষে প্রকাশ করা যাবে না। বাঙ্গালির হৃদয়ে রবীন্দ্রনাথের

যে শ্রদ্ধার আসন, একথা বললে প্রকৃত বাঙ্গালিরা এদের আস্তাকুঁড়ে ফেলে দেবে। তাই মুখে স্পিকটি নট। বরং তার এইরকম লেখাগুলিকে এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ।

তিলক সেদিন চেয়েছিলেন শিবাজীর যুদ্ধকৌশল, বীরত্বের কাহিনি ছড়িয়ে পড়ুক সারা দেশে। আর তা বজ্র হয়ে ঝরে পড়ুক ব্রিটিশ রাজশক্তির ওপর। তাই সারা দেশে, রাজ্যে রাজ্যে শিবাজী উৎসবের আয়োজন। তিলকের অনুপ্রেরণায় ও অনুরোধে যুব সমাজের মনে স্বাধীনতার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জ্বালিয়ে দিতে রবীন্দ্রনাথ শিবাজী মহারাজের উপর লিখেছিলেন নাটক, যা সে সময় বঙ্গ, অসম, ত্রিপুরায় মঞ্চস্থ হয়েছিল। ভারতে বিদেশি মুঘল শাসনকালে এক সামান্য জায়গিরদার শাহজী ভোঁসলের পুত্র শিবরাজে যেভাবে মা জিজাবাঈ ও গুরু সমর্থ রামদাসের শিক্ষায় ও প্রেরণায় দিল্লির বাদশা ঔরঙ্গজেবের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিলেন সে তো যেন রূপকথার কাহিনি।

মাত্র হাতে গোনা কিছু মাওয়ালি যুবককে নিয়ে সেনাদল গঠন করে মুঘলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে দখল করে নিয়েছিলেন একে একে ২৭৬টি দুর্গ। দেশ জুড়ে শত্রু পরিবেষ্টিত হয়েও ১৬৭৪ সালের ৬ জুন রায়গড় দুর্গে কাশীর পণ্ডিত গগাভট্টের পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে যেভাবে হিন্দুপদ পাদশাহি অর্থাৎ স্বাধীন হিন্দুরাষ্ট্রের সম্রাট হয়েছিলেন তা বিস্ময়কর। তিলকের ভাবনায়, 'ছত্রপতি শিবাজী যদি অল্প সেনা নিয়ে কেবল বুদ্ধিমত্তা ও প্রখর রণকৌশলের সাহায্যে প্রবল পরাক্রমী মুসলমান শাসককে নাস্তানাবুদ করে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে পারেন তবে মুষ্টিমেয় কিছু লালমুখো ব্রিটিশকে তাড়িয়ে আমরা কেন স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে পারবো নো? তাই ব্রিটিশের বিরুদ্ধে শিবাজীর যুদ্ধ কৌশলই হোক ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রামীদের প্রেরণা'। সেই উদ্দেশ্যেই তিনি সারাদেশে শিবাজী উৎসব প্রবর্তন করেছিলেন। পঞ্জাবকেশরী লালা রাজপত রায় ছত্রপতি কবিতা এবং শিবাজীর জীবনী পুস্তক প্রকাশিত করেছিলেন।

বাঙ্গলা, পঞ্জাব, মহারাষ্ট্রের ত্রিমুখী ধারায় প্রবাহিত হয়েছিল ছত্রপতি শিবাজীর বীরত্ব গাথা। বিপ্লবী আন্দোলনের অন্যতম প্রবাদ পুরুষ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুও ব্রিটিশ বিরোধী যুদ্ধে গ্রহণ করেছিলেন শিবাজীর রণকৌশল। ব্রিটিশ কারাগারে থাকাকালীন তিনি শিবাজীর জীবনী পাঠ করে অনুপ্রাণিত হয়ে তাকে স্বাধীনতা যুদ্ধে গুরুর স্থানে বসিয়েছিলেন। ১৯২৮ সালে মহারাষ্ট্রের পুনেতে এক ভাষণে সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, 'আজ শিব ছত্রপতি অত্যাচারী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের প্রতীক হয়ে উঠলেন। স্বাধীনতা যুদ্ধে আমাদের প্রেরণা শিবাজীর যুদ্ধনীতি।' তারপর যখন তিনি এলগিন রোডের বাড়িতে ব্রিটিশ সেনার দ্বারা গৃহবন্দি হয়ে ছিলেন তখন তিনি ভেবেছিলেন শিবাজী মহারাজ যদি ঔরঙ্গজেবের বন্দিদশা থেকে কৌশলে পালিয়ে যেতে সমর্থ হন তবে আমি নয় কেন? এবং সত্যি সত্যি একদিন শিবাজীর মতো তিনিও ব্রিটিশের চোখে ধুলো দিয়ে বিদেশে পাড়ি দিয়েছিলেন। শুধু পাড়ি দেওয়াই নয়, দেশের স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে কখনো হিটলার, কখনো জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোজো, যখন যার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে ব্রিটিশকে ভারত ছাড়া করা যাবে, কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা আসবে, সব পন্থাই তিনি গ্রহণ করেছিলেন, যা ছিল শিবাজীরই রণকৌশল— মারি অরি পারি যে কৌশলে।

শুধু নেতাজী নন, একবার এক চাঁদনী রাতে স্বামী বিবেকানন্দ মাদ্রাজের দক্ষিণ সমুদ্র সৈকতে এক বাঙ্গালির বাংলোর বারান্দায় বসে ক্ষেত্রীর মহারাজার একান্ত সচিব মুন্সি জগমোহনলালের সঙ্গে কথা বলছিলেন। আরও দু'একজন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। হঠাৎ স্বামীজী কবিভূষণ রচিত ছত্রপতি শিবাজীর বন্দনা গীত গাইতে শুরু করলেন এক ডাক্তার হঠাৎ বলে উঠলেন, কিন্তু স্বামীজী আমি যে স্কুলে পড়েছি শিবাজী একজন ধূর্ত-নীতিহীন, ডাকাত, ছিনতাইকারী, বিশ্বাসঘাতক, খুনি ছিলেন। থেমে গেল স্বামীজীর গান। তাঁর দু'চোখে ক্রোধের আগুন, বললেন, আপনি জাতির লজ্জা। আপনি শিক্ষিত হয়ে এটাও জানেন না যে ভারত গত ৩০০ বছরের মধ্যে এমন একজন সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা তৈরি করেছে, যিনি ছিলেন শিবের অবতার। যাঁর আবির্ভাবের মধ্যে মহারাষ্ট্রের সাধু-সন্তেরা ম্লেচ্ছদের হাত থেকে হিন্দুদের উদ্ধারের আশার আলো দেখতে পেয়েছিলেন। শিবাজীর চেয়ে বড়ো বীর, বড়ো সাধক, বড়ো ভক্ত, বড়ো রাজা আছে কি? শিবাজী ছিলেন একজন জন্মজাত পুরুষ-শাসকের মূর্ত প্রতীক। বিদেশি মুঘল শাসকদের দ্বারা লিখিত ভারতীয় ইতিহাস পড়লে আপনার মহাপুরুষ, আপনার সংস্কৃতি, ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা জাগবে কী করে? জেনে রাখুন, শিবাজী জাতির প্রকৃত চেতনার প্রতিনিধিত্ব করেছেন।' এই ছিল শিবাজীর সম্বন্ধে স্বামীজীর শ্রদ্ধাবোধ।

ঐতিহাসিক আচার্য যদুনাথ সরকার শিবাজী সম্পর্কে বলেছেন, 'শিবাজীর চরিতকথা আলোচনা করিয়া আমরা এই শিক্ষা পাই যে, প্রয়াগের অক্ষয় বটের মতো হিন্দুজাতির প্রাণ মৃত্যুহীন। কত শত বৎসরের বাধা-বিপত্তির ভার ঠেলিয়া ফেলিয়া আবার মাথা তুলিবার, আবার নতুন শাখা পল্লব বিস্তার করিবার শক্তি তাহাদের মধ্যে নিহিত আছে। ধর্মরাজ্য স্থাপন করিলে, চরিত্র বলে বলীয়ান হইলে, নীতি ও নিয়মানুবর্তিতাকে অন্তরের সহিত মানিয়া লইলে, স্বার্থ অপেক্ষা জন্মভূমিকে বড়ো ভাবিলে, বাগাড়ম্বর অপেক্ষা নীরব কার্যকে সাধনার লক্ষ্য করিলে জাতি অমর হয়।'

ব্রিটিশ পরাধীনতাকালে তিলকের প্রচেষ্টায় শিবাজী উৎসব দেশের কোণে কোণে যেভাবে প্রভাব ফেলেছিল তাতে শত অত্যাচারও বিপ্লবীদের মনে ভয়ের উদ্রেক করতে পারেনি। এই বঙ্গপ্রদেশে সখারাম গণেশ দেউস্করের মতো কত শিক্ষক শিবাজীর জীবনের বীরত্বের কাহিনি শুনিয়ে কত বারীন্দ্র ঘোষের যে জন্ম দিয়েছে (আলিপুর বোমা মামলার আসামি) তার ইয়ত্তা নেই। ভূদেব মুখোপাধ্যায়, আর সি দত্ত, নবীনচন্দ্র সেন, শরৎচন্দ্র শাস্ত্রী, গিরিশচন্দ্র ঘোষ— এদের লেখা শিবাজীর জীবনী, নাটক, কাব্য পাঠ করে বঙ্গ বীরেরা জীবন বাজি রেখে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। এই বাঙ্গলারই অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর প্রভৃতি গুপ্ত সংগঠনগুলিও শিবাজীর ছবিকে সামনে রেখে শিবাজীর জীবন থেকে প্রেরণা গ্রহণ করেছে। মধ্য ও উত্তর ভারতের স্বতন্ত্রতা সেনাদল, অভিনব ভারতের সদস্যরা ছত্রপতি শিবাজী এবং তাঁর আরাধ্য দেবী মা ভবানীর সামনে মন্ত্রগুপ্তির শপথ নিতেন। শিবাজী ছিলেন ভারতের স্বাধীনতা সেনানীর পথপ্রদর্শক। আর সেই শিবাজী ও শিবাজীর আদর্শকে যিনি সারা ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তিনি আধুনিক ভারতে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধের আহ্বায়ক— বালগঙ্গাধর তিলক। □

অধ্যাত্মবাদী রবীন্দ্রনাথ ও সনাতন ধর্ম

বলা হয়, লক্ষ্মী-সরস্বতীর সহাবস্থান হয় না। কিন্তু বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কাছে দুজনই বাঁধা পড়েছিল। একদিকে ঠাকুর পরিবারের জমিদারি অতুল বিত্ত ও ঐশ্বর্য, অন্যদিকে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষী। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা দর্শনের দিগন্ত প্রসারিত সীমান্ত পরিসীমা। তিনি ছিলেন মূলত কবি। মানব জীবনের এমন কোনো ক্ষেত্র নেই, যেখানে তাঁর বিচরণ ঘটেনি। দার্শনিক চিন্তাধারার দিক থেকে আমরা রবীন্দ্রনাথকে ভাববাদী বলতে পারি। তিনি বলেছেন, 'আমাদের জীবনে যা অতিরিক্ত, তারই অন্তহীন দেশে থাকেন প্রেমের দেবতা। আমাদের চেতনাকে বিচ্ছেদ বোধের মায়া থেকে মুক্ত করেন।' এই মুক্তি ভারতীয় দর্শনের মূল কথা। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা দর্শন তাঁর জীবন দর্শন দ্বারাই প্রভাবিত। তিনি বলেছেন, 'তাকেই বলি শ্রেষ্ঠ শিক্ষা যা কেবল তথ্য পরিবেশন করে না যা বিশ্ব সত্তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের জীবনকে গড়ে তোলে।'

অধ্যাত্ম দর্শন তাঁর ভারত তীর্থ কবিতায় 'হেথা একদিন বিরামহীন মহা ওঁঙ্কার ধ্বনি, হৃদয় তন্ত্রে একের মন্ত্রে উঠেছিল রণরনি।' 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতায় তাঁর প্রতিভার লক্ষণীয় উন্মেষ ঘটে— 'জাগিয়া উঠেছে প্রাণ, ওরে উথলি উঠেছে বারি, ওরে, প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ, রুধিয়া রাখিতে নারি।' কবি-হৃদয় যেন কারাপ্রাচীর ভেঙে গুঁড়িয়ে পরিপূর্ণ আত্মপ্রকাশের কাঙ্ক্ষিত জগতে প্রবেশের ছাড়পত্র করায়ত্ত করে ক্ষুদ্র জীবন থেকে বৃহৎ জীবনে মিলিত হওয়ার ব্যাকুলতায় অধীর হয়ে উঠে। আবার গীতাঞ্জলির গানগুলিতে ভগবানকে তিনি স্পর্শ করতে চাইছেন। আমাদের দেশে ভগবান তাঁর সুউচ্চ সিংহাসন ছেড়ে নেমে এসেছেন— সবার পিছে, সবার নীচে, সবহারাদের মাঝে। গীতাঞ্জলির অধিকাংশ গানে রসের কথা অপেক্ষা সাধারণ কথা, বড়ো আনন্দ অপেক্ষা বেদনার কথা বেশি। তিনি গীতাঞ্জলি কাব্যে পূর্জা পর্যায়ের ৬৫তম কবিতায় লিখেছেন, 'সীমার মাঝে অসীম, তুমি বাজাও আপন সুর, আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এতো মধুর। তিনি নিরাকার অসীমকে তাঁর দেহ সাকারের মধ্যেই দর্শন করেছেন। এরূপ শত কবিতায়, শত গানে প্রকৃতির মধ্যে প্রাণকে দর্শন করেছেন। উপনিষদের সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। এবং শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার ১৩তম অধ্যায়ের ২৮নং শ্লোকে বলা হয়েছে— সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠতং পরমেশ্বরম্। বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি।। অর্থাৎ যিনি সর্বভূতে সমান ভাবে অবস্থিত বিনাশীল দেহের মধ্যেও অবিনাশী পরমাত্মাকে দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ দর্শন করেন। ভারতীয় এই আধ্যাত্ম দর্শন ও এই আত্মদর্শন বিমুখ হিন্দুত্ব বিরোধী রূপধারীরা মূর্তিপূজায় অবিশ্বাসীরা মূর্তি ভাঙচুর ও অন্যান্য ভাবে অমর্যাদা করে থাকে। যেমন ২০২১ সালে বসন্ত বরণে কবিগুরুকে অমর্যাদা।

—**রবীন্দ্রনাথ রায়,**
শিয়ালদহ, রাশিডাঙ্গা, কোচবিহার।

'শলাপরামর্শ'

অজয় সরককার বলেছেন— সংবিধানের চূড়ান্ত খসড়া গৃহীত হওয়ার পর, লিখিত সংবিধানের চেহারা কেমন হবে, তা নিয়ে সংবিধান প্রণেতাদের মধ্যে বেশ শলাপরামর্শ চলে। কথাটিতে বিভ্রান্তির অবকাশ রয়েছে। 'শলাপরামর্শ' শব্দটির আভিধানিক তাৎপর্য 'গোপন মন্ত্রণা'। লিখিত সংবিধানের অলংকরণের বিষয়টি খোলাখুলি আলোচনা করে স্থির করা হয়েছিল।

নিবন্ধটিতে (স্বস্তিকা, ২৩.১.২০২৩), বলা হয়েছে--- 'Constituent Assembly-এর সদস্যদের উপস্থিতিতে এবং তাদের (এসআইসি) স্বাক্ষর করা সম্মতিতে ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর 'জানুয়ারি থেকে লাগু হয়। তবে সংবিধানের প্রধান প্রধান অংশসমূহ ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি থেকে লাগু হওয়ার জন্য...।' প্রকৃত ঘটনা হলো ১৯৪৯-এর ২৬ জানুয়ারি আমাদের সংবিধান Constituent Assembly-তে সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়েছিল এবং ১৯৫০-এর জানুয়ারি লাগু হয়েছিল। প্রধান প্রধান অংশ নয়, পুরো সংবিধানটি।

—**বিমলেন্দু ঘোষ,**
কলকাতা-৬০।

এরকম নির্মম রসিকতা কেন?

পেনশহীন অবসরপ্রাপ্ত বয়োবৃদ্ধ যাঁরা বার্ধক্যের কারণে অন্য কোনো জীবিকা গ্রহণে অপারগ হয়ে শুধুমাত্র অবসরের সময় প্রভিডেন্ড ফান্ড এবং গ্র্যাচুয়িটির প্রাপ্ত অর্থ ব্যাংকের বিভিন্ন ফিক্সড ডিপোজিট খাতে জমা রেখে প্রাপ্ত সুদে জীবন ধারণ করে থাকেন তাঁদের বছরে একবার ১৫এইচ ফর্ম জমা দিতে হয়। এ বছর ওই ফর্ম জমা দিতে গিয়ে জানা গেল ফিলড্ আপ ফর্মে ই-মেল আইডি থাকা বাধ্যতামূলক। এখন প্রশ্ন যাদের বয়স ৭০, ৭৫ বা আরও বেশি তাদের মধ্যে কতজনের কম্পিউটার সম্পর্কে জ্ঞান আছে বা ই-মেল আইডি আছে? তাদের বাড়িতে কম্পিউটার নেই বা তাদের ই-মেল আইডি নেই জানালে তাদের বলা হচ্ছে কোনো একটা কম্পিউটার সেন্টারে গিয়ে ই-মেল আইডি করিয়ে আনুন। তাও না হয় হলো। কিন্তু ব্যাংক বা ইনকাম ট্যাক্স অফিস যদি কোনও মেল পাঠায় তাহলে প্রাপক সেটা পাবে কীভাবে? মেল তো যাবে সেই কম্পিউটার সেন্টারে। তাছাড়া যাঁর ই-মেল করানো হলো তার পাসওয়ার্ড তো অন্য কেউ জেনে যাবে। তাহলে সমূহ বিপদের আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে নাকি? অবসরপ্রাপ্ত বরিষ্ঠ নাগরিক যাদের অধিকাংশের বয়স ৭০, ৭৫, ৮০ বা তদুর্ধ তাদের এভাবে বিব্রত করার অর্থ কী বোধগম্য হচ্ছে না। একেই তো সিনিয়র সিটিজেন্স সেভিংস স্কিম-সহ অন্যান্য স্কিমের সুদের হার ব্যাংক ক্রমাগত কমিয়েই চলেছে তারপর গোদের ওপর এই বিষফোঁড়া।

—**শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়,**
ডেজিরে কমপ্লেক্স, বড়বাজার, চন্দননগর।

ফ ঃ ৩

সমলিঙ্গের বিবাহ : আদালত ভারতভাগ্য বিধাতা নয়

তারক সাহা

আদালত কখনো মানুষের মনের অধিনায়ক নয়, তেমন নয় ভারতের ভাগ্যবিধাতা। সংবিধান তাকে সে অধিকার দেয়নি। অথচ আজকাল দেখা গেছে শীর্ষ আদালত সামাজিক পরিসরেও নাক গলাতে শুরু করেছে। যেমন সমলিঙ্গের বিবাহ। সব আবেদন যে আদালতকে শুনতে হবে এমন বাধ্যবাধকতা শীর্ষ আদালতের নেই। এমন নজিরও আছে আদালতের এক্তিয়ারভুক্ত নয় এমন বিষয় আদালত খারিজ করেছে।

সমলিঙ্গের বিয়ে শুধু মাত্র এক শ্রেণীর মানুষ যারা সমাজের সম্পদশালী গোষ্ঠীভুক্ত কিছু পরিবারের বিপথগামী তরুণ তরুণীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। শতাংশের হিসেবে এই সংখ্যা অতি নগণ্য হলেও এই বিয়েকে সাংবিধানিক বৈধতা দিতে অতি তৎপর শীর্ষ আদালত। পাঁচ বিচাপতির মূল্যবান সময় ব্যয় হচ্ছে কেবল একটি সামাজিক অচিরাচরিত বিষয়কে সাংবিধানিক মান্যতা দিতে। অথচ পশ্চিমবঙ্গের সরকারি কর্মচারীদের ডিএ মামলা শুনানির বিষয়টি মাসের পর মাস পড়ে রয়েছে। আদালতের কাছে মানুষের অতি জরুরি মামলার শুনানির চেয়ে বেশি জরুরি পড়ে গেল বিচারপতিদের কাছে সমলিঙ্গের বিয়ের মামলা শোনার। ইতিমধ্যেই নয়টি শুনানি হয়েছে শীর্ষ আদালতে।

সমলিঙ্গের বিয়ের এই বিষয়ে সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু? ইতিমধ্যেই শীর্ষ আদালতের বার কাউন্সিলের প্রায় সব সদস্য এর বিরোধিতা করেছেন। নবম শুনানির দিনেই তিনটি রাজ্য যেমন অসম, রাজস্থান ও অন্ধ্রপ্রদেশ বিরোধিতা করে আবেদন পাঠিয়েছে। ইতিমধ্যেই বিজেপি শাসিত রাজ্য গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ তাদের অভিমত জানিয়েছে।

শুনানির নবম দিনে আদালতকে সতর্ক করে দিয়ে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহেতা বলেছেন যে, এই বিয়েকে সাংবিধানিক বৈধতা সংবিধানের ১৪১ অনুচ্ছেদ অনুসারে দিলে সারা দেশে এর মান্যতা লাগু হয়ে যাবে। দেশের আনাচে কানাচে এই বৈধতা কতটা মানুষ পালন করছে তার চৌকিদারি করবে কে? এর ওপর নজরদারি করার পরিকাঠামো আদালতের আছে তো?

সমলিঙ্গের বিয়ে কি সমাজ সংস্কারক কোনো বিষয়? সত্যি বলতে কী এই ইস্যুটি সাধারণ মানুষের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নয়। সাধারণ মানুষের কাছে বড়ো ইস্যু হলো দৈনন্দিন সমস্যা। এই একেবারে অসামাজিক বিষয়ে আদালত মাথা না ঘামিয়ে বরং ডিএ মামলার শুনানি ত্বরান্বিত করলে আরও বেশি উপযোগী হতো। আমাদের এই দেশ নজিরবিহীন সমাজ সংস্কার দেখেছে। এই রাজ্যে ঘটে যাওয়া সমাজ সংস্কারের মাধ্যমে রয়েছে বিধবা বিবাহ বাল্যবিবাহ রদ, সতীদাহ প্রথা রদের মতো বিষয়ে। সমাজ সংস্কার হয়েছে আদালতের মাধ্যমে নয়, হয়েছে রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগরের মতো মনীষীদের মাধ্যমে। পরে এসেছে আদালতের মান্যতা যা পরবর্তীকালে আইনে পরিণত হয়েছে। মনে হয়, শীর্ষ আদালতের কিছু বিচারপতি তথাকথিত এই সমলিঙ্গের বিয়েকে মান্যতা দিয়ে বিচারবিভাগীয় ইতিহাসে অমর হয়ে থাকতে চাইছেন।

> **আদালত কোনো ভাবেই জনগণমন অধিনায়ক নয়। যথার্থ ভাবেই দেশে ভাগ্যবিধাতা হলো নাগরিক নির্বাচিত সংসদ। সমলিঙ্গের বিবাহকে সাংবিধানিক বৈধতা দেওয়া আদালতের আওতায় নয়।**

বিবাহ যেমন সামাজিক বন্ধন তেমনি এর সঙ্গে জড়িত বিবাহিতদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ। এই বিষয়ে নবম শুনানির সময় শিশু অধিকার রক্ষাকারী জাতীয় পরিষদ তীব্র আপত্তি জানিয়েছে সমলিঙ্গের বিবাহিতাদের সন্তানদের আইনি সুরক্ষার কী হবে— তা নিয়ে শীর্ষ আদালতের সওয়ালে। পরিষদ আদালতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়েছে বৈধ, অবৈধ্য সন্তানদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত।

ভারত আজ স্বাধীন দেশ। ভারত আজ সংবিধান স্বীকৃত একটি দেশ যেখানে গণতন্ত্রই এদেশের মূল মন্ত্র। সার্বভৌমত্ব এদেশে স্বীকৃত নাগরিকদের দ্বারা। গণতান্ত্রিক উপায়ে এদেশের সরকার নির্বাচিত হয় এবং সরকারের পিছনে রয়েছে জনপ্রতিনিধি দ্বারা নির্বাচিত সংসদ। আর আদালতের কাজ হলো সংসদে আনীত বিলের মাধ্যমে তৈরি আইনের ব্যাখ্যা করা এবং ভুল ভ্রান্তি থাকলে তার শুধরে দেওয়া। সংবিধানে এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশ আছে।

বিশেষ বিবাহ আইন সংসদ স্বীকৃত আইন। এই আইন তৈরি হয়েছে হিন্দু ব্যক্তি আইনকে কাটা-ছেঁড়া করে। সংসদের বাইরে ভিতরে অনেক চর্চা ও বিতর্কের মধ্যে দিয়ে। এরমধ্যে যুক্ত রয়েছে বিভিন্ন ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ এবং আধুনিক মতামত ও যুক্তি। শীর্ষ আদালতের দায়িত্ব এর ভুল সংশোধন করা। আদালতের কাজ নয় তাদের মতামত নাগরিকদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া।

আদালত কোনো ভাবেই জনগণমন অধিনায়ক নয়। যথার্থ ভাবেই দেশে ভাগ্যবিধাতা হলো নাগরিক নির্বাচিত সংসদ। সমলিঙ্গের বিবাহকে সাংবিধানিক বৈধতা দেওয়া আদালতের আওতায় নয়। সামাজিক ইস্যুতে আদালতের নাক না গলানোই ভালো দেশ ও নাগরিক স্বার্থে। □

মা-লক্ষ্মীর সংসার

সুতপা বসাক ভড়

'লক্ষ্মী' বলতে আমরা বুঝি ধনসম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, শান্তির দেবী। ঘরের মেয়ে-বউদের আমরা এই 'মা-লক্ষ্মী' রূপেই দেখে থাকি। নিজের মেয়ে থেকে শুরু করে অন্যের মেয়েকেও 'লক্ষ্মী মা-আমার' অনায়াসে সম্বোধন করা হয়। সেইরকম, বাড়ির বউকে 'লক্ষ্মী-বউ' বলার সঙ্গে সঙ্গে একটি শান্ত-বুদ্ধিমতী গৃহিণীর ছবি ভেসে ওঠে আমাদের মনের মধ্যে। আবার ছোট্ট ছেলেকে 'লক্ষ্মীছেলে' বললে সেও খুশি, আমরাও খুশি। এইভাবে সংসারে যা আমাদের ভালো লাগে, আদরের, কাঙ্ক্ষিত তাদের আমরা 'লক্ষ্মী' নামের সঙ্গে জুড়ে নিতে ভালোবাসি।

সাধারণত, ঘরের লক্ষ্মী বলতে আমরা বুঝি বাড়ির বউকে। এই ঘরের লক্ষ্মী সারাদিন পরিবারের মঙ্গলকামনায় নিজেকে ব্যস্ত রাখে। সকালে তার কাজ হয় বাড়ি-ঘর-দোর পরিষ্কার করা। কারণ পরিষ্কার বাড়িতেই 'মা-লক্ষ্মী' আগমন হয়। যতই আধুনিক আমরা হই না কেন, বাসি বাড়ি কেউ রাখি না— যেভাবে হোক বাড়ি পরিষ্কার করতেই হয়। এরপর বাড়ির বউটি স্নান সেরে পূজা করে—সেখানেও সংসারের মঙ্গলকামনা। পুরনো রীতি মেনে চলা অনেক পরিবারে আজও লক্ষ্মীর ঝাঁপি যথাস্থানে অধিষ্ঠিত।

ভাত রান্নার সময় চালের ভাণ্ডারকে প্রণাম করেই চাল বের করার রেওয়াজ আমাদের পরিবারের; আবার নেওয়া চাল থেকে একমুঠো তুলে রাখা— 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' যেন কখনও না ফুরায়— এ যেন অনাদিকালের সংস্কার এখনও বজায় আছে। আগে একটি আলাদা কৌটোতে ওই চাল তুলে রাখা হতো — প্রয়োজন-অপ্রয়োজনে কাজে আসত। এখনও অনেক পরিবার এই প্রথাটি বাঁচিয়ে রেখেছে। গৃহলক্ষ্মীর আরেকটি দিক অর্থসঞ্চয়— সংসারের খরচ বাঁচিয়ে সামান্য কিছু হলেও তা লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে তুলে রাখা। সিঁদুর, কড়ি দিয়ে সাজানো লাল রঙের 'লক্ষ্মীর ঝাঁপি' সত্যিই যেন মা-লক্ষ্মীর প্রতিভূ।

অনেক পরিবার খেতে বসে ইষ্টদেবকে নিবেদন করে খাওয়ার প্রচলন আজও ধরে রেখেছে। এইভাবে খেলে একটা তৃপ্তি আসে শরীরে ও মনে। লক্ষ্মীর প্রকৃত অবস্থান যেন এইসব পরিবারেই দেখা যায়। অন্নকে সম্মান করা আমাদের কর্তব্য। অন্ন কখনও নষ্ট করতে নেই। চালেই মা-লক্ষ্মীর অবস্থান। সেই চালের অবমাননা করা আমাদের সংস্কৃতিতে নেই। একবার পূজনীয়া আনন্দময়ী মা নর্দমাতে ভাত বয়ে যেতে দেখে খুব অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর

অঙ্গনা

বক্তব্য ছিল যে তাঁরা সন্ন্যাসিনী— ভিক্ষান্নে তাঁদের দিনযাপন, সেই ভিক্ষান্নের যেন কখনও অবমাননা না হয়— এ ছিল তাঁর জীবন, তাঁর লোকশিক্ষা। সেজন্য থালায় যতটুকু ভাত প্রয়োজন ততটুকুই নেওয়া উচিত। খাবারের অপচয় যেন মা-লক্ষ্মীর সংসারে না হয়। আমাদের সংস্কারে চাল, দুধ, ঘি ইত্যাদি নষ্ট হওয়া অশুভ মনে করা হয়— এই ভাবে আমরা জন্ম থেকে সংস্কারিত হই অপচয় না করায়। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিতে আছে প্রকৃতি আমাদের প্রয়োজন পূর্ণ করতে সক্ষম, কিন্তু আমাদের শোষণ সহ্য করতে অপরাগ। সেজন্য আমরা যেন প্রয়োজনের নামে প্রকৃতিকে শোষণ করে তার অপচয় না করি। আমরা যা পাচ্ছি— সবই প্রকৃতি দান (প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে), সেই প্রকৃতিকে সম্মান করা আমাদের কর্তব্য। একজন ঘরের লক্ষ্মী প্রতি পদক্ষেপে তার কর্তব্যনিষ্ঠার চিহ্ন রেখে যায়।

সোনা হারানো অমঙ্গল, সেজন্য ঘরের লক্ষ্মী সোনার যত্ন নেয়। এইভাবে— সে একজন সঞ্চয়কারিণী। জল বয়ে যাওয়া মানে অর্থ চলে যাওয়া। ঘরের লক্ষ্মী সদা তৎপর থাকে যাতে জলের অপচয় না হয়। এইভাবে সে জল-সংরক্ষণ করে চলেছে। ঘরের লক্ষ্মী আমাদের মিতব্যয়ী, সঞ্চয়ী, সরল, সাধাসিধে জীবন-যাপনের প্রেরণা দেয়। এটাই হিন্দু মানসিকতায় বাড়ির বউয়ের ছবি— যেখানে উচ্ছৃঙ্খলতার লেশমাত্র চিহ্ন নেই— আছে শুধু এক অপরিসীম শান্তির অনুভূতি।

ঘরের লক্ষ্মীর কাছে শাড়ি, গয়না, আসবাব বিলাসব্যসনের সামগ্রী হয়। সেজন্য সে ন্যূনতম প্রয়োজনটুকুতে প্রথমে নিজে অভ্যস্ত হয় এবং পরিবারের বাকিদেরও তাতে অভ্যস্ত হবার প্রেরণা জোগায়। বেশি প্রয়োজন মানেই প্রকৃতির ওপর চাপ সৃষ্টি করা, তাতে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়। এইভাবে সবদিক রক্ষা করে চলে ঘরের লক্ষ্মী।

পার্থিব বস্তু কখনও মনের শান্তি দেয় না। সাময়িক ভাবে হয়তো একটু স্বস্তি, সুখ হয়, কিন্তু এর দীর্ঘস্থায়িত্ব নেই, চাহিদার শেষ নেই। একটি চাহিদা পূরণ হলেই আমরা আর একটি চাহিদার দিকে হাত বাড়ালে, সেটি পেলে আবার আরেকটির দিকে— এইভাবেই চলে আমাদের কখনও না শেষ হওয়া চাহিদার শৃঙ্খলা। অল্পেই সন্তুষ্ট আমাদের ঘরের লক্ষ্মীটি। আবার দান-ধ্যানও করে সে। সময়ের সদ্ব্যবহার যে করে, সেজন্য সময়ও যথাসময়ে তাকে স্বীকৃতি দেয়।

ঘরের লক্ষ্মীর দায়িত্ব অনেক। কাজ অনেক। সন্তানদের যথাযথভাবে বড়ো করার দায়িত্বও তার। এই যে, আমরা প্রায়শ অভিযোগ করি যে নতুন প্রজন্ম উচ্ছন্নে যাচ্ছে— তার জন্য দায়ী কে? বড়োদের জীবনশৈলী থেকেই তো তারা অনেকটা শেখে। মা'র দায়িত্ব অনেক। তাকে অনেক প্রলোভন ছাড়তে হয়। সংযমী হতে হয়। তবেই তাকে দেখে নতুন প্রজন্ম শেখে। এই শিক্ষা বই পড়ে হয় না, জীবন থেকে শিখতে হয়। মা-লক্ষ্মীর সংসারেই আমাদের জীবনের পাঠশালা।■

শিল্পচর্চা করলে শিশুর মানসিক বিকাশ বৃদ্ধি পায়

ডাঃ পার্থসাথি মল্লিক

মূলত ছয় মাসের মধ্যেই মানুষের মস্তিষ্কের অর্ধেক গঠিত হয়ে যায় এবং আট বছরের মধ্যে তৈরি হয় ৯০ শতাংশ। তবে একটি শিশু বড়ো হলে কেমন হবে তার ভিত্তি তৈরির জন্য তিন থেকে ছয় বছর বয়স খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই বয়সের মধ্যেই সাধারণত একটি শিশুর ব্যক্তিত্বের মূল ভিত্তিটা গঠন হয়ে যায়। জীবনের শুরুর এ সময়টায় উৎসাহ জোগানো, খেলাধুলা ও শিক্ষাই তার পরিপূর্ণ বিকাশে সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা রাখে।

মায়ের গর্ভে থাকার সময় থেকে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর যে বিকাশ ঘটে, তা হচ্ছে প্রারম্ভিক বিকাশ। বিকাশের এই পর্ব চলে জন্মের পর থেকে আট বছর বয়স পর্যন্ত। তবে তিন থেকে ছয় বছর বয়সের সময়ে পরিবার শিশুকে কীভাবে গড়ে তুলছে, কী শেখাচ্ছে তার উপর নির্ভর করে বড়ো হয়ে তার বুদ্ধিমত্তা, স্বভাব, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, আচরণ, আত্মবিশ্বাস ইত্যাদি কেমন হবে। আপাতদৃষ্টিতে সুস্থ শিশু বলতে শারীরিকভাবে সুস্থ শিশুকেই বোঝায় না; শারীরিক ও মানসিক উভয়ভাবে শিশুকে সুস্থ রাখতে হবে। সাধারণভাবে মানুষ শিশুর শারীরিক বিকাশে যতটা মনোযোগ দেয়, মানসিক বিকাশে কতটা মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা বোধ করে না। কিন্তু মানসিকভাবে সুস্থ না হলে শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়।

দুই বছর বয়স পর্যন্ত শিশু মনোযোগ দিয়ে শোনে, কথায় সাড়া দেয়, শব্দের অনুকরণ করে, বিভিন্ন অর্থবোধক শব্দ বলে, বড়োদের কাজকর্ম অনুকরণ করে, বন্ধুত্ব গড়ে তোলে, সমস্যার সমাধান করে ও খেলাধুলা শুরু করে। তিন থেকে ছয় বছরে শিশুরা বিষয়বৈচিত্র্য নিয়ে নতুন নতুন জিনিস শেখাটা

উপভোগ করে, দ্রুত ভাষা রপ্ত করতে থাকে, কোনও বিষয়ে বেশি সময় মনোযোগ ধরে রাখার সক্ষমতা অর্জন করে এবং নিজের মতো করে কিছু করতে ছটফট করে থাকে।

সুস্থ পারিবারিক পরিবেশ : একটি শিশু যখন বড়ো হয়, তখন চারদিকের পরিবেশ তাকে অনেক বেশি প্রভাবিত করে এবং এর প্রতিফলন ঘটে তার ব্যক্তিত্বে। শিশুর সামগ্রিক বিকাশের সঙ্গে পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা নিবিড়ভাবে জড়িত। শিশুরা পর্যবেক্ষণ করে যে মা-বাবার সম্পর্ক কতটা উষ্ণ। তাঁদের মধ্যে যদি একে অপরের প্রতি বিনয়, শ্রদ্ধাবোধ, আন্তরিকতা থাকে, একে অপরের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া, একজন আরেকজনকে বিশ্বাস করা, তাঁদের ভাষার ব্যবহার সুন্দর কি না এই সবকিছুই শিশুরা অনুসরণ করে। এগুলো নিয়েই সে বড়ো হয়। তাই তার সুন্দর ও নির্ভয় শৈশব নিশ্চিত করার দায়িত্ব মা-বাবা-সহ পরিবারের সব সদস্যের।

বুদ্ধির বিকাশ ঘটাতে সৃজনশীল খেলনা : বয়সভেদে শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ উপযোগী খেলনা নির্বাচন করতে হবে গুরুত্বের সঙ্গে। ঘরে ও বাইরে দুই জায়গায়ই খেলা যায় এমন খেলনা শিশুর মানসিক বিকাশে বেশি সহায়ক।

৩-৬ বছর বয়সে যা ঘটে : শিশুর জন্মের পর প্রথম এক হাজার দিন বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়টায় শিশু সরাসরি পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সংস্পর্শে আসতে শুরু করে। তবে তিন থেকে ছয় বছরের মধ্যে সে জগৎ সমাজের নতুন অনেক কিছুর সঙ্গে পরিচিত হতে শুরু করে। এই সময় শিশুর দাঁড়ানো হাঁটা, দৌড়ানো, কথা বলা, কানে শোনা, ঘ্রাণ নেওয়া, পড়াশোনা এগুলো শেখে। এই সময়টাতে সে স্বাধীন আচরণ শুরু করে। নতুন কিছু নেড়েচেড়ে দেখা, জানতে চাওয়া শুরু হয়। এই সময়ে শিশু যদি সঠিক খাবার, খেলাধুলার সুযোগ না পায়, বেড়ে ওঠার পরিবেশ যদি সুস্থ না থাকে, তাহলেও তার শরীর ও মস্তিষ্কের বিকাশ সঠিকভাবে হয় না।

আঁকাআঁকি : দীর্ঘদিনের গবেষণায় দেখা গেছে, শৈশবে তিন থেকে ছয় বছর সময় হতেই শিশুরা যদি আঁকার সুযোগ পায়, তাহলে তারা মেধাবী ও বুদ্ধিমান হয়। বিজ্ঞানীদের মতে, শিল্পচর্চার মাধ্যমে শিশুদের মানসিক বিকাশের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। অভিনব চিন্তার মাধ্যমে শিশু যখন বিভিন্নভাবে শিল্পচর্চার সুযোগ পায়, তখন তার সৃজনশীলতাও বৃদ্ধি পায়। সে অসাধারণভাবে ভাবতে ও চিন্তা করতে শেখে শৈশব হতেই।

আমি পারি : 'আমি পারি' এই আত্মবিশ্বাস ও স্বাধীনতাবোধ তৈরি করা যায় এই বয়সটায়। নিজের হাতে খেতে দিলে কিছু খাবার যদি ফেলেও দেয় তবুও তাকে সেটি করতে দেওয়া উচিত। খাবার টেবিলে শিশুকে একসঙ্গে নিয়ে খেতে বসলে সব ধরনের খাবারে আগ্রহ হবে। একই সঙ্গে শিশুকে কিছু পছন্দ করতে দিতে হবে, তার মতামত জানতে চাইতে হবে। তাকে সারাক্ষণ সব কাজে সাহায্য না করে সমস্যা সমাধান করতে দিতে হবে। অন্য শিশুদের সঙ্গে খেলাধুলায় উৎসাহিত করলে সে সামাজিক হয়ে উঠবে। □

হিন্দু সাম্রাজ্যের উদ্গাতা ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ

কল্যাণ গৌতম

হিন্দুধর্ম-বিরোধী ঐতিহাসিকেরা এবং শিক্ষামন্ত্রীরা সুবিচার করেননি বলেই শিবাজী সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানতে অসমর্থ হয়েছে স্বাধীন ভারতের পড়ুয়ারা। মুঘল সাম্রাজ্যের পক্ষে ঢক্কানিনাদের মাঝে শিবাজীকে রাখা হয়েছিল 'বনসাই'য়ের মতো ছেঁটে। রবীন্দ্রনাথের 'শিবাজী উৎসব' কবিতাটি না পড়লে হয়তো ছত্রপতি শিবাজীর প্রতিভা বা মৌলিকতা আমাদের হৃদয়ঙ্গম হতো না। প্রয়াগের অক্ষয় বটের মতো মৃত্যুহীন হিন্দু জাতির প্রাণ 'ফেকড়ি'র মতো পুনরায় গজিয়ে উঠেছিল শিবাজীর ধর্মরাজ্য স্থাপনের মধ্যে দিয়ে, আর এই ক্ষাত্রধর্মে শক্তি জোগালেন সাধুসমাজের নেতা 'মহাসমর্থ' গুরু রামদাস।

শিবাজীর তপস্যাতেজের রূপ কি দেখেছে বাঙ্গালি হিন্দু? বুঝেছে কি সেই রুদ্রলীলা? একদিন মারাঠার প্রান্ত থেকে ভৈরব রবে ধর্মরাজ শিবাজী আমাদের ডাক দিয়েছিলেন! চমকে উঠেছিল তাঁর কৃপাণদীপ্তি! মৃত্যুহীন বাণী-রূপ এনে দিয়েছিল নতুন প্রভাত। 'একধর্মরাজ্য হবে এ ভারতে' এই সম্বলই ছিল তাঁর মহাবচন। সেদিন যদি তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে না থাকি আমরা, তবে রাবীন্দ্রিক ভাষায় আজই বলার সময় এসেছে—

"মারাঠির সাথে আজি, হে বাঙ্গালি, এক কণ্ঠে বলো
'জয়তু শিবাজী'।
মারাঠির সাথে আজি, হে বাঙ্গালি, এক সঙ্গে চলো
মহোৎসব সাজি।
আজি এক সভাতলে ভারতের পশ্চিম-পুরব
দক্ষিণে ও বামে
একত্রে করুক ভোগ একসাথে একটি গৌরব
এক পুণ্য নামে।"

তিনি মহারাজ শিবাজী। তিনি মধ্যযুগীয় ভারতে হিন্দু রাজা হয়ে একটি অসাধ্য সাধন করলেন। মুঘল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে প্রতিস্পর্ধী হয়ে বিক্ষিপ্ত পরাজিত এক জাতিকে নবজীবন দিলেন, স্বাধীনতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করলেন হিন্দুকে, শ্রেষ্ঠ প্রশাসক হিসেবে প্রমাণ করে দিলেন

হিন্দুরাষ্ট্রের সমস্ত বিভাগের কাজ চালিয়ে ধর্মরক্ষা করতেও সমর্থ হিন্দু। দীর্ঘ সময় পরাধীনতার নাগপাশে বাঁধা থেকে আজকের দিনে রাষ্ট্রনির্মাণে হিন্দুদের যে বোধ, তার শুভ সূচনা ঘটেছিল শিবাজীর রাজ্যাভিষেকে।

ত্রি-সাধশতবর্ষ পূর্বে তাঁর রাজ্যাভিষেকের দিনটি আজও প্রাসঙ্গিক। এবার আগামী ১৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩০; ২ জুন, ২০২৩ শুক্রবার জ্যৈষ্ঠ শুক্লা ত্রয়োদশী তিথি। আগের দিন বৃহস্পতিবার সকাল ১১টা ১৮ মিনিট থেকেই স্পর্শ করছে ত্রয়োদশী। ১৬৭৪ খ্রিস্টাব্দের (১৫৯৬ শকাব্দ) এমনই তিথিতে বৃহস্পতিবারে মহারাষ্ট্র-ক্ষত্রিয়-কুলাবতংস ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ রাজ্যাভিষিক্ত হন। নৃশংস ইসলামি শক্তির সঙ্গে নিয়ত সংগ্রাম করে হিন্দুশক্তির জয়ের দিনটির স্মৃতি চিহ্ন ধারণ করে রয়েছে জ্যৈষ্ঠের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিটি। সেই শুভক্ষণে মহারাষ্ট্রের রায়গড় দুর্গে অসামান্য দূরদর্শী এক হিন্দু যোদ্ধা সিংহাসনে অভিষিক্ত হয়ে পরাধীন ভারতবর্ষের মাঝে এক স্বাধীন হিন্দু সাম্রাজ্যের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করে তুললেন। এ যে কত বড়ো জয়, ভাবা যায় না। এই সমারোহটির ফলশ্রুতিতে রক্ষা পেল হাজার হাজার বছরের সনাতনী ভারত-সংস্কৃতির অমূল্য সম্পদ, পুনরুজ্জীবিত হলো বেদ-বিদ্যার মণিমাণিক্য, রক্ষা পেল গো-ব্রাহ্মণ, হিন্দু তীর্থের ধ্বজপতাকা। হিন্দুধর্মের বিজয়বৈজয়ন্তী যদি সে সময়ে, সপ্তদশ শতকে পুনরায় উড্ডীন না হতো, চিরকালের জন্য হারিয়ে যেত এই উচ্চ দর্শনের ধারা। পৃথিবী পরে কেবল দুটি ধর্মসম্প্রদায়ের লড়াইয়ের এবং দখলের ক্ষেত্র হয়ে উঠতো। ভারতীয় মহাপুরুষের মহত্ত্ব প্রকাশ করবার জন্য কেউই অবশিষ্ট থাকতেন না। শিবাজী মহারাজের সীমাহীন সাহস,

সার্থকতা ও সৌকর্য এই কারণেই।

'মরাঠা' বলতে বাইরে থেকে যে 'নেশন' বা জনসঙ্ঘ বুঝি, তা আদতে যুগের প্রয়োজনে কয়েকটি জাত বা কাস্ট এক ছাঁচে ঢালা হয়ে অগ্রসর হয়ে যাওয়া একটি 'রাষ্ট্রসঙ্ঘ', যা ভারতের অন্য কোনো প্রদেশে কখনও সম্ভব হয়নি। শিবাজী যে হিন্দু-আধারিত মরাঠা-মিলন গেঁথে তুললেন বা তার আগেই সেই কাজটি ধীরে ধীরে চলছিল, যা শিবাজীর সময়ে এবং পরবর্তীকালে তাঁর পুত্রপৌত্রদের রক্তদানে সংহত হয়ে উঠলো, তা এক যুগধর্মের প্রয়াসে এবং প্রচেষ্টায়। 'মরাঠা' জাত এবং তার নিকটাত্মীয় 'কুনবী' জাতের অধিকাংশই একদা সৈন্য ও প্রহরীর কাজ করেছে। এই দুই জাতের সমন্বয়েই শিবাজীর সেনাদল গড়ে উঠেছিল, যদিও তাঁর সেনাবাহিনীতে সেনাপতি বরণের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থরাও ছিলেন। এই বিক্রম, এই বীর্য তাঁরা কোথা থেকে পেলেন? পেলেন মহারাষ্ট্রের মতো প্রকৃতিদেবীর হাতে গড়ে তোলা দেশময় গিরিদুর্গের অধিকারী হয়ে। পেলেন সহ্যাদ্রি পর্বতশ্রেণীর পাহাড় বনে ঢাকা দুর্গম অঞ্চলে দীর্ঘদিন নির্জন বাসের ফলে। আত্মরক্ষা করতে ও আক্রমণকারীকে বাধা দিতে দিতে। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে চীনা পর্যটক মরাঠা জাতিকে দেখেছিলেন সাহসী, বুদ্ধিমান, পরিশ্রমী, তেজস্বী ও যুদ্ধপ্রিয় হিসেবে— যারা উপকারে কৃতজ্ঞ, কিন্তু অপকারে প্রতিহিংসা নেবার আগে শত্রুকেও শাসিয়ে যায়। এখন আধুনিক মরাঠা জাতের যে শাখায় শিবাজী আবির্ভূত হয়েছিলেন, তারা হলেন 'ভোঁসলে', জমি-চাষ ও পশুপালনই ছিল তাদের জাতিগত ব্যবসা। কিন্তু ষোড়শ শতকের প্রথমে বাহমনি সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ার সময় এবং তার একশো বছর পর আহমেদনগরে নিজামশাহি রাজবংশের পতনের সময়ে এই জাতি লাঙ্গল ছেড়ে হাতে তলোয়ার ধরে নিল। শুরু করলো সৈনিকের ব্যবসা, ক্রমশ হয়ে উঠলো জমিদার এবং রাজা, সৈন্যের দলপতি, রাজদরবারে সামন্ত এবং অবশেষে স্বাধীন নরপতি।

নানান সদ্‌গুণের আধার ছিলেন তিনি; স্বাধীনতার উপাসক, বীরেন্দ্র সমাজের বরণীয় তিনি, কিন্তু রিপুর বশবর্তী ছিলেন না, ছিল উদারতা, সদাচার পরায়ণতা, সাধু সহবাসের আকাঙ্ক্ষা। তাঁর রাজত্বে নারীর মর্যাদা ছিল প্রশ্নাতীত। বিভিন্ন ঐতিহাসিক তাঁর উপর যে দুর্নাম আরোপ করেছেন তাঁর সঙ্গে বাস্তবতার কোনো যোগ ছিল না বলে প্রমাণ সহযোগে উপস্থাপন করেছেন ১৩০৯ বঙ্গাব্দে শিবাজী মহোৎসব উপলক্ষ্যে প্রদত্ত ভাষণে সখারাম গণেশ দেউস্কর। বিধর্মী ও বিজেতৃ জাতির দ্বারা বিজিত জাতির ইতিহাস লেখা হলে এমন ভ্রম বিচিত্র নয় বলেই তাঁর অভিমত।

শিবাজীর রাজপতাকা ছিল 'ভগবা ঝাণ্ডা', যা আসলে এক গেরুয়া উত্তরাধিকার। শিবাজীর দীক্ষাগুরু ছিলেন রামদাস স্বামী, যার জন্য সাতরা দুর্গ জয় করার পর সজ্জনগড়ে আশ্রম নির্মাণ করে দিয়েছিলেন শিবাজী (১৬৭৩)। গুরুকে অঢেল ধন আর ঐশ্বর্য দান করলেও তাঁকে দৈনিক ভিক্ষায় যেতে দেখে শিবাজী অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। গুরুদেবের সাধ মেটাবেন, পণ করলেন শিবাজী। রাজ্যের যা কিছু সম্পদ, এমনকী গোটা রাজ্যটাই গুরুকে দান করার শপথ নিলেন। এর জন্য যাবতীয় দলিল-দস্তাবেজ প্রস্তুত করলেন, তৈরি হলো দানপত্র। পরদিন সকালে গুরু রামদাস যখন ভিক্ষাপাত্র নিয়ে বের হবেন, স্বয়ং মরাঠারাজ তথা হিন্দু-অস্মিতা শিবাজী গুরুর পদতলে সমর্পণ করলেন সমগ্র রাজ্য। গুরু শিষ্যকে বুকে টেনে নিয়ে মৃদু হেসে বললেন, 'তোমার দান আমি গ্রহণ করলাম; এখন থেকে তুমি আমার গোমস্তা হলে। ভোগসুখী ও স্বেচ্ছাচারী রাজা না হয়ে বিশ্বাস করো, তুমি যেন এক জামিদার প্রভুর বিশ্বাসী ভৃত্য হয়ে রাজকার্য পরিচালনা করছো। এমনই রাজ্যশাসনের দায়িত্বজ্ঞান যেন তোমার থাকে।' শিবাজী মেনে নিলেন হিন্দু যোগীর সর্বাধিনায়কত্ব। সেই থেকে শিবাজীর রাজ্য পরিণত হলো এক হিন্দু সন্ন্যাসীর ভাবাদর্শে-চালিত রাজ্য, এক যোগী-রাজ্য। রামদাস স্বামীর রাজ্যাধিকার চিহ্নিত হয়ে থাকলো হিন্দু সাম্রাজ্যের জাতীয় পতাকা গৈরিক বর্ণে রঞ্জিত হয়ে। সন্ন্যাসীর গেরুয়া বস্ত্রখণ্ড দিয়েই নির্মিত হলো রাজপতাকা।

রামদাস স্বামী প্রণীত 'দাসবোধ' গ্রন্থটি শিবাজী নিত্যপাঠ করতেন। শিবাজীর ধর্মানুরাগের প্রাবল্য কখনও হ্রাস পায়নি। তাঁর নিজের মনেও এই ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে, মা ভবানী স্বয়ং স্বরাজ্যস্থাপন ও স্বধর্মরক্ষার জন্য তাঁকে প্রেরণ করেছেন। এই অটল ভগবন্নিষ্ঠা ও বিশ্বাসই তাঁকে 'হিন্দুপদ পাদশাহি'-র প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ করেছে। সমর্থ করেছে মুঘলশাহি, আদিলশাহি ও কুতবশাহির বুকে হিন্দুরাজ্যের পতাকা উড্ডীন করতে।

স্বধর্মের দুর্দশা দেখে ব্যথিত স্বামী রামদাস শিবাজী এবং তাঁর কর্মচারীদের ক্ষাত্রধর্ম সম্পর্কে দীর্ঘ উপদেশ দিয়েছেন। এই উপদেশে শিবাজী জারিত ছিলেন বলেই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পেরেছিলেন। গুরু রামদাস বলছেন, 'যিনি মৃত্যুকে ভয় করেন, তাঁহার ক্ষাত্রধর্ম অবলম্বন করা উচিত নহে— অন্য কোনো উপায়ে উদরপূর্তি করা কর্তব্য। যাহারা সমরে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে, তাহাদিগকে ইহলোক লজ্জা ও অপমান এবং মরণান্তে নরকভোগ করিতে হয়। কামানের গোলা যেরূপ নির্ভয়ে সৈন্যদলের মধ্যে গিয়ে পতিত হয়, প্রকৃত ক্ষত্রিয় সেইরূপ নিঃশঙ্কচিত্তে শত্রুসৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করেন। সকলে একোদ্যমে উত্থিত হইলে শত্রুদিগের জন্য আর ভয় কী? ব্যাঘ্র যেরূপ সর্বসমক্ষে মৃগযূথকে ধরাশায়ী করে, ওইরূপে উত্থিত হইলে শত্রুদিগকেও সেইরূপে বিনষ্ট করিতে পারা যায়।' এমন গুরুর সামীপ্যে-সান্নিধ্যে থাকার জন্য ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ হয়ে উঠতে পেরেছিলেন তিনি।

আমরা শিবাজী-রামদাস দ্বৈরথটিকে আধুনিক ভারতে খুঁজে পাই স্বামী প্রণবানন্দ ও ড. শ্যামাপ্রসাদের মধ্যে হিন্দু জাতিগঠন ভাবনার উত্তরাধিকার রচনায়। যুগাচার্য স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজ হিন্দু-জাতি-গঠন সংক্রান্ত নানা ভাষণ ও কাজে বারবার হিন্দুহৃদয় সম্রাট ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের প্রসঙ্গ উত্থাপন করতেন। ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হিন্দু সম্মেলনে হিন্দু রক্ষীদল গঠনের আহ্বান জানান তিনি এবং হিন্দু সমাজের বিপন্নতার বিষয় তুলে ধরেন। কারণ ১৯৩৭ সালের পর থেকে বাঙ্গলার রাজনীতিতে মুসলমান আধিপত্য বাঙ্গালি হিন্দুজীবনে গভীর সংকট তৈরি করেছিল। নোয়াখালিতেও তার ব্যত্যয় ঘটলো না, গোলাম সারওয়ার ও গোফরানের নেতৃত্বে কৃষক সমিতির অন্তরালে একদল মানুষ হিন্দুদের মধ্যে ক্রমাগত আতঙ্ক সৃষ্টি করছিল; তারপর যা হয়েছিল, ইতিহাস তার সাক্ষী। ১৯৪০ সালের ৭ মে নোয়াখালিতে অনুষ্ঠিত হিন্দু সম্মেলনে হিন্দু রক্ষীদল কেমন হবে, তা বলতে গিয়ে বললেন, 'ছত্রপতি শিবাজী, শিখগুরু গোবিন্দ সিংহের

জাতি গঠনের পদ্ধতি যেমন ছিল, আমার হিন্দু-জাতি- গঠন-আন্দোলনও সেই ধারায় পরিচালিত।' তাঁর আশীর্বাদধন্য ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, যাকে 'শিবাজীর কার্যকরীরূপ' বলে বর্ণনা করা হয়, তিনি নোয়াখালির হিন্দুদের দুর্দশাকে এবং তার মোকাবিলাকে রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অগ্রাধিকার দিলেন। স্বামী প্রণবানন্দ এই যাত্রায় দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসকারী শিবের রুদ্রমূর্তি সঙ্গে নিয়েছিলেন আর সঙ্গে নিয়েছিলেন বাছাই করা বীরদের। 'আমি কোনো কাপুরুষকে আমার সঙ্গে নেবো না, মাথা দিতে পারে, মাথা নিতে পারে— এমন লোক আমার সঙ্গে চলুক।' ত্রিশূল হস্তে আচার্যদেব মঞ্চে সর্বদা সমাসীন থাকতেন, পরীধানে পীতোজ্জ্বল কৌষেয় বসন, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, মূর্তিতে শিবাজীর পথে হিন্দুজাতি গঠন ও ধর্মরক্ষার বাণী। তাঁর সাফ কথা, 'হিন্দু শির দিয়েছে, কিন্তু সার দেয় নাই।' আগের দিন ৬ মে পূর্ববঙ্গের বাবুরহাট সম্মেলনেও বললেন, 'আজ প্রত্যেক হিন্দুকে রাণাপ্রতাপের মতো, ছত্রপতি শিবাজীর মতো, শিখগুরু গোবিন্দ সিংহের মতো স্বধর্ম ও স্বসমাজের রক্ষার ব্রত ও দায়িত্ব গ্রহণপূর্বক জাতিগঠন মন্ত্রে দীক্ষিত হতে হবে।' বাঙ্গালি হিন্দুর শিরায় শিরায় দুর্জয় বীর্যসঞ্চারের জন্য, হৃদয়ে দুর্দম সংকল্প প্রবাহের জন্য ১৩ মে কুমিল্লার হিন্দু সম্মেলনে তিনি আবার শিবাজী-স্মরণ করলেন, 'শিবাজী ও গুরুগোবিন্দ সিংহ যে পন্থায় যথাক্রমে মরাঠ ও শিখ জাতিকে মহাজীবন দান করেছিলেন, আমি বাঙ্গলায় সেই সংগঠন-পদ্ধতিক্রমে পরাক্রমশালী হিন্দু-সংহতি গঠনে বদ্ধপরিকর। এই আত্মরক্ষা ও আত্মগঠন প্রচেষ্টাকে যথেষ্ট প্রবল করে তুলতে পারলে হিন্দুসমাজের যাবতীয় তুচ্ছ ভেদ-বিবাদ, ঘৃণা-বিদ্বেষ বিদূরিত হয়ে যাবে।'

এরপর দেখা যায় যুগাচার্য হিন্দুদের পাশে সতত অবস্থান করবার এক প্রবল পরাক্রমশালী হিন্দু নেতার সন্ধানে রত হলেন, যার মধ্যে শিবাজীর মতো অকুতোভয় শক্তি সঞ্চারিত আছে। অবশেষে ১৯৪০ সালের ২৬ আগস্ট জন্মাষ্টমীর দিন শ্যামাপ্রসাদকে রুদ্ধদ্বারে ডেকে নিয়ে জাগালেন তার মধ্যে থাকা যাবতীয় উদ্যম ও নৈপুণ্য। প্রণবানন্দ-জীবনীকার স্বামী বেদানন্দ 'শ্রীশ্রী যুগাচার্য জীবন চরিত' গ্রন্থে খোলাখুলি লিখেছেন, 'নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে শ্যামাপ্রসাদের প্রচেষ্টা ও সাফল্য মেবারের মহারাণা প্রতাপ অথবা মহারাষ্ট্রের ছত্রপতি শিবাজীর কীর্তির সহিত তুলনীয়। আচার্যের আশীর্বাদ শক্তিসমৃদ্ধ শ্যামাপ্রসাদের অন্তরে সুপ্ত সিংহ গর্জন করিয়া উঠিল। বাঙ্গলার তথা সমগ্র ভারতের নেতাদের বিরুদ্ধে তিনি একক মহাবিক্রমে অভ্যুত্থান করিলেন। পাকিস্তান-রাক্ষসের কবলে সমগ্র বাঙ্গলাকে উৎসর্গ করিবার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া বাঙ্গলার এক-তৃতীয়াংশ পশ্চিমবঙ্গ ছিনাইয়া আনিয়া বাঙ্গালি হিন্দুর দাঁড়াইবার স্থান ও অস্তিত্ব রক্ষার উপায় করিয়া দিলেন। বাঙ্গলার বীর সন্তান শ্যামাপ্রসাদের জীবন- মাধ্যমে এইরূপে আচার্যের বাঙ্গলা ও বাঙ্গালি জাতির রক্ষার সংকল্প রূপায়িত হইয়াছিল।'

স্বামী প্রণবানন্দজীকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল 'মহামৃত্যু কী?' (What is Real Death?) তিনি উত্তর দিয়েছিলেন 'আত্ম-বিস্মৃতি' (Forgetfulness of the 'self')। নিজেকে ভুলে যাওয়া, নিজের পূর্ব ইতিহাস ভুলে যাওয়া, নিজের পরিবার, গোষ্ঠী, ধর্মের প্রতি নেমে আসা অসংখ্য আক্রমণের ধারাবাহিকতা ভুলে যাওয়ার নামই হলো 'আত্ম-বিস্মৃতি'। বাঙ্গালি হিন্দু হয়ে উঠেছে এক চরম আত্মবিস্মৃত জাত। তারা সহজেই তার উপর নেমে আসা প্রভূত-প্রহার ভুলে যায়; অপরিমিত অন্যায়-অত্যাচার বিস্মৃত হয়। ভুলে যায় বলেই তাদের ক্রমাগত পালিয়ে বাঁচতে হয় 'পূর্ব থেকে পশ্চিমে', আরও পশ্চিমে। দৌড় দৌড় দৌড়! জলছবিটির মতো গ্রাম ছেড়ে অনিশ্চিত জীবনের সন্ধানে নিজের ধর্ম নিয়ে দৌড়! মা-বোন-বউ-মেয়েকে মাংস-হাতড়ানো ভয়ংকর পশুর মুখে ফেলে রেখেই নিজের জীবন বাঁচানোর দৌড়! এই আত্মবিস্মৃতি থেকে বাঙ্গালি তখনই রেহাই পাবে, যখন যাবতীয় জীবনের জিঘাংসার সালতামামি ভুলতে দেবে না! সম্প্রীতির আলিঙ্গন নিয়ে বাস করেও প্রতিবেশীর আক্রমণের সহিংসতার ইতিহাস মনে রাখবে! বাঙ্গালি হিন্দু টিকে থাকবে কিনা, তাঁর পরীক্ষা তখনই শুরু হবে।

এখন এই জোরজবরদস্তির জীবন থেকে মুক্তির পথ কোথায়? পলায়নপর হিন্দু বাঙ্গালির মুক্তি ও শেষ গন্তব্য কোথায়? সে কি তার আপন ধর্ম-সংস্কৃতি বজায় রেখে, সন্তান-সন্ততি নিয়ে নিরুপদ্রবে বেঁচেবর্তে থাকতে পারবে না? পারবে। হিন্দুকে বেঁচে থাকতে হলে সংগঠিত হয়েই থাকতে হবে, প্রায় একশো বছর আগেই বলে গিয়েছিলেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা, হিন্দুরক্ষী স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ। বলেছিলেন 'সঙ্ঘশক্তি কলিযুগে'। তিনি সঙ্ঘশক্তি সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন, কারণ ছিন্নবিচ্ছিন্ন বিশাল জাতিকে এক ধর্মসূত্রে গেঁথে নেবার প্রয়োজন আছে। তিনি হিন্দুকে মহামিলনে সম্মিলিত করাকে সেবা আখ্যা দিয়েছিলেন। হিন্দু বাঙ্গালির সংস্কৃতি ভারতীয় সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য উত্তরাধিকার। এই কাজে বাঙ্গলার শুভবুদ্ধিসম্পন্ন বিদ্বজ্জনের অংশগ্রহণ জরুরি, জরুরি ছাত্র ও যুবশক্তির অংশগ্রহণ, মাতৃশক্তির মহাজাগরণ। এর জন্য প্রত্যেকের মানসিক শক্তি চাই। শরীর সবল ও সুস্থ থাকলেই মানুষ মানসিক শক্তিতে বলীয়ান হতে পারে। মানুষ ভয় পেলে আর শক্তিহীন হলে তোতাপাখির মতো শেখানো বুলি শুনিয়ে যায়। পেশীতে শক্তি না থাকলে সে অমেরুদণ্ডীর মতো আচরণ করে। তখন দু'-চারশো মানুষের জনশক্তিতে ভরপুর গ্রামেও আট দশজন হিংস্র মানুষের আক্রমণ প্রতিহত করতে পারে না। মনে রাখতে হবে, হিন্দু বাঙ্গালির ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে এক দুষ্ট শক্তি, তাতে বাইরের দেশের বৃহত্তর মদত আছে। সেই পশুশক্তি প্রতিবেশীর রূপ ধারণ করে আমাদের মধ্যে লুকিয়ে আছে এবং তারা ঐতিহাসিক কারণেই শক্তিমান। স্বামী প্রণবানন্দজীর মতে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রতি রক্ষা তখনই সম্ভব হবে, যখন উভয়েই শক্তিশালী ও মত প্রকাশে বলিষ্ঠ হবে। বারে বারে এমনই যোদ্ধা ও সন্ন্যাসীর সহাবস্থানই বোধহয় হিন্দু জাতির পতনকে রোধ করতে সক্ষম হবে। রামদাস-শিবাজীর এই ঐক্যতান অবলোকন করাই হিন্দু সাম্রাজ্য দিনোৎসবের মূল সুর। এজন্যই আমরা ছত্রপতি মহারাজ শিবাজীর জয়ধ্বনি করি।

তথ্যসূত্র :

১. যদুনাথ সকরার (প্রথম সংস্করণ ১৯২৯, ওরিয়েন্ট লংম্যান দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯১), শিবাজী। পৃষ্ঠা-১-১৭৮।

২. সত্যচরণ শাস্ত্রী (জয়শ্রী প্রকাশন ২০১৯) ছত্রপতি মহারাজ শিবাজীর জীবনচরিত। পৃষ্ঠা-১৭-৩২০।

শিবাজীই ভারতে হিন্দুসমাজের আলোকবর্তিকা

ড. জিষ্ণু বসু

সপ্তদশ শতকেই মহাকবি ভূষণ লিখেছিলেন, —
কাসিহু কী কলা জাতী মধুরা মসীদ হোতী।
সিবাজী ন হোতো তো সুনতি হোত সবকী।।

সত্যিই কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের আর পুনরুদ্ধার সম্ভব হতো না, মথুরা আজ মসজিদে পরিণত হতো, যদি শিবাজী মহারাজ না থাকতেন তবে ভারতবর্ষের সকলেই ধর্মান্তরিত হয়ে যেত। আজও যে ভারতবর্ষে হিন্দুধর্মের বিজয়ধ্বজা উড্ডীন, আজও যে এই আর্যাবর্ত হিন্দুরাষ্ট্র-হিন্দুস্থান, সারা পৃথিবীর মানুষ অনুভব করছে শাশ্বত হিন্দুধর্মের বিশ্বমঙ্গলের মহামন্ত্র, সেই কৃতিত্ব যেসব কতিপয় মহাবীরের অসির প্রতাপে সম্ভব হয়েছে তার মধ্যে শিবাজীর নাম সবার প্রথমে।

ভারতবর্ষ ছাড়া পৃথিবীতে যে কটি দেশে আরব সাম্রাজ্যবাদীরা ইসলামের ধ্বজা নিয়ে পৌঁছেছিল তাদের সবকটি দেশেই প্রাচীন সভ্যতা সংস্কৃতি সব ধুয়েমুছে সাফ হয়ে গেছে। মিশরের এত পুরাতন সভ্যতার কোনো চিহ্নই আজ নেই, ইরানের পারসিক সভ্যতাকেও খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু ভারতবর্ষ শেষ হয়ে যায়নি। সেই অপরাজিত হিন্দু ভারতের বিজয়রথের মাথায় যে বিজয় পতাকা তাতে স্বর্ণাক্ষরে লেখা নাম ছত্রপতি শিবাজীরাজে ভোঁসলে। ভারতবর্ষের সতত সংগ্রামের ইতিহাস আমাদের পাঠ্যক্রমে এখনো অনুপস্থিত। ৭১২ সালে মহম্মদ বিন কাশিম যেদিন সিন্ধুপ্রদেশ দখল করে সেই দিনটিকে যদি হিন্দু গৌরবের পতনের সূত্রপাত ধরা হয় তবে তার পরের ৮০০ বছর হিন্দুবীরেরা লড়াই করেছেন, দেশমাতৃকার জন্য প্রাণ বলি দিয়েছেন। ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে ২০ এপ্রিল পানিপথের প্রথম যুদ্ধে মুঘল বংশীয় বাবরের কাছে ইব্রাহিম লোদির পরাজিত হওয়ার পর থেকেই যেন ভারতবর্ষের মধ্যযুগের ইতিহাস শুরু। ৭১২ থেকে ১৫২৬ মানে এই ৮১৪ বছরের ইতিহাসের কতটুকুই আমরা জানি?

ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ভারতের একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে তামিল কবি কবিচক্রবর্তী কম্বন রামাবতারম (রামায়ণ) লিখছেন চোল সম্রাট তৃতীয় কুলোতুঙ্গার রাজসভায়। অষ্টম শতাব্দীতে কেরালার ছেলে আদি শঙ্করাচার্য সারা ভারতকে একে ধর্মবন্ধনে বাঁধার চেষ্টা করেছিলেন। পঞ্চদশ শতকে কেরালার মাধবাচার্য এবং শিষ্যেরা জ্যোতির্বিদ্যায় দিগন্ত এনেছিলেন। তখন আজকের কেরালার সবটুকু অংশ জুড়ে শাসন করছেন সামুদ্রি রাজারা। পর্তুগিজরা যার উচ্চারণ করতো জামুরিন বলে। ১৫৬৫ সাল পর্যন্ত কর্ণাটকে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের প্রতাপ অক্ষুণ্ণ ছিল।

১৫১৮ সাল পর্যন্ত মুসুনুরী নায়েকরা অন্ধ্রপ্রদেশ বা তেলেঙ্গানাতে দিল্লির

সুলতানদের দাঁত ফোঁটাতে দেননি। তাই দক্ষিণ ভারতে ৭১২ সালের কয়েকশো বছর পরেও আরব, তুর্কি বা উজবুকেরা ঢুকতে পারেনি। পক্ষান্তরে ১৪০০ সালের প্রথম দিকেই আজকের মহারাষ্ট্র দেবগিরির যাদবদের পরাজয়ের পর থেকে ধীরে ধীরে মুসলমান শাসনে চলে আসে।

১৫১৮ সালে বাহমনি সুলতানির পতনের পরে মহারাষ্ট্র জুড়ে পাঁচ হুজুরের মধ্যে এক মাৎস্যন্যায় চলতে থাকে। একদিকে আহমেদ নগর সুলতানের নিজামশাহি, গোলকুণ্ডার কুতুবশাহি, বিদরের বিদরশাহি আর এলিচপুরের ইমাদশাহি। আজকের মুম্বাই অবশ্য গুজরাটের সুলতানের দখলে ছিল। এই পাঁচ হুজুরের সঙ্গে আর একজনের নাম অবশ্যই করতে হয় তিনি হলেন অম্বর মালিক। ইনি এক সিদ্দি ভাড়াটে সেনাবাহিনীর সর্দার। আফ্রিকার ইথিওপিয়া থেকে ক্রীতদাস হিসেবে মালিককে ভারতে আনা হয়েছিল। কালক্রমে সেই মালিক পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের এক সেনাবাহিনীর সর্দার হয়ে ওঠেন। এই চরম অরাজকতার মধ্যে ১৬৩০ সালে শিবাজী মহারাজের জন্ম। এক অজ্ঞাতকুল ভোঁসলে বংশে। নিজ প্রতাপে, বীরত্বে, সাংগঠনিক ক্ষমতা আর তুখোড় বুদ্ধিতে তিনি অসাধ্য সাধন করেছিলেন। তিনি সেনাপতি বা মন্ত্রীদের জায়গির দেওয়ার বদলে বেতন দেওয়া শুরু করলেন।

শিবাজী মহারাজ হিন্দুসমাজের সবচেয়ে বিপদের সময়ে নেতৃত্ব হাতে নিয়েছিলেন। আওরঙ্গজেব মুঘল সম্রাটদের মধ্যে সবচেয়ে সাম্প্রদায়িক ছিলেন। কাশী বিশ্বনাথ মন্দির ছাড়াও তিনি শতশত মন্দির ভেঙে দিয়েছিলেন। সেই নিদারুণ অবস্থা থেকে হিন্দু সমাজ ফিরে দাঁড়িয়েছিল। শিবাজী রায়গড় দুর্গে তাঁর প্রশাসনিক রাজধানী স্থাপন করলেন। বিজয়দুর্গের মতো পুরাতন দুর্গের সংস্কার করলেন। সিন্ধুদুর্গের মতো নতুন দুর্গ নির্মাণ করলেন। সম্পূর্ণ এক নতুন জীবন পেল হিন্দুসমাজ।

বিচক্ষণ শিবাজী মহারাজা বুঝেছিলেন যে ইংরেজ, ডাচ, ফরাসি আর পর্তুগিজ শক্তি থেকে আসন্ন বিপদের কথা। তাই কোঙ্কণ সমুদ্র সৈকতের অনতিদূরে খুরতে দ্বীপে তৈরি করেন এক দুর্গ। এটিই ভারতবর্ষে তৈরি প্রথম সমুদ্র দুর্গ। শিবাজীর নৌসেনাই দেশের প্রথম। শিবাজী পর্তুগিজ কামান ও বন্দুক কারখানা দখল করেন। ১৬৫৭ সালের ২৮ নভেম্বর গোয়ার ভাইসরয় পর্তুগালের রাজাকে চিঠি লেখেন, শাহজীর ছেলে 'আপার চাউল'-এর দখল নিয়ে নিয়েছেন। শিবাজী সেখানে রো লেইতে ভিয়েগাস আর ফার্নাও লেইতো ভিয়েগাসকে পেয়েছিলেন। এই দুই ভাই অস্ত্রযুক্ত জাহাজ বানাতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। সে যুগে সূচিত হলো আধুনিক যুদ্ধজাহাজ-সহ হিন্দুর বিজয় যাত্রা। পানহালা দুর্গের যুদ্ধে আফ্রিকার সেনাপতি সিদ্দি জৌহরকে নাস্তানাবুদ করা দক্ষিণ ভারতে তো বটেই সারা দেশেই এই আবিসিনিয়া বা হাবসি যোদ্ধাদের প্রতি ভয় কেটে যায়। গেরিলা যুদ্ধেও যে হিন্দুরা আফ্রিকা থেকে আনা হাবসিদের থেকে বেশি দক্ষ তা প্রমাণ হয়।

হিন্দু রাজশক্তিকে জাগ্রত করার জন্য তিনি নিজে 'হিন্দু পদপাদশাহী' উপাধি গ্রহণ করেন। মারাঠা শক্তির মাধ্যমে হিন্দু রাজশক্তি ধীরে ধীরে সমগ্র ভারতবর্ষের অধিকার ফিরে পায়। পেশোয়া প্রথম বাজিরাওয়ের রাজত্ব আফগানিস্তানের সীমান্ত পেশোয়ার থেকে তামিলনাড়ু পর্যন্ত পৌঁছেছিল, পূর্বে বাংলাদেশের নবাব তাদের পদানত হয়েছিল। পলাশীর যুদ্ধের মাত্র ২০ বছর আগে ১৭৩৭ সালে মারাঠা শক্তি দিল্লির অধিকার নিয়েছিল। শাহজাহান লালকেল্লা আর জামা মসজিদ বানিয়েছিলেন। মারাঠারা তার মাঝখানে 'গৌরীশঙ্কর মন্দির' নির্মাণ করেছিলেন। যাতে দিল্লিশ্বর জগদীশ্বর ভগবান শঙ্করের দর্শন করে দিন শুরু করতে পারেন। শিবাজীর এই রাজ্যাভিষেকে হিন্দুর স্বাভিমান জাগ্রত হওয়াকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিপ্লবীরা আদর্শ হিসেবে নিয়েছিলেন। ১৮৯৫ সালে বাল গঙ্গাধর তিলক রায়গড় দুর্গে শিবাজী উৎসব শুরু করলেন। রমেশচন্দ্র দত্ত লিখলেন 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত'। এত শতাব্দী পরেও শিবাজীই হিন্দু সমাজের সামনে অন্ধকারে আলোকবর্তিকা। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ শিবাজীর এই অবদান স্মরণ করে লিখেছিলেন শিবাজী উৎসব কবিতায়—

'কোন দূর শতাব্দের কোন এক অখ্যাত দিবসে/নাহি জানি আজি
মারাঠার কোন শৈলে অরণ্যের অন্ধকারে বসে,
হে রাজা শিবাজী,
তব ভাল উদ্ভাসিয়া এ ভাবনা তড়িৎ প্রভাবৎ/এসেছিল নামি—
'একধর্মরাজ্যপাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত/বেঁধে দিব আমি।'

"শিবাজীর এই রাজ্যাভিষেকে হিন্দুর স্বাভিমান জাগ্রত হওয়াকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিপ্লবীরা আদর্শ হিসেবে নিয়েছিলেন। ১৮৯৫ সালে বাল গঙ্গাধর তিলক রায়গড় দুর্গে শিবাজী উৎসব শুরু করলেন। রমেশচন্দ্র দত্ত লিখলেন 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত'। এত শতাব্দী পরেও শিবাজীই হিন্দু সমাজের সামনে অন্ধকারে আলোকবর্তিকা।"

ফঃ ৪

বসু বিজ্ঞান মন্দিরে লোকপ্রজ্ঞার বিজ্ঞানসভা অনুভব দর্শন

‘জ্ঞানং বিজ্ঞানং সহিতং’— এই লোগো নিয়ে সর্বভারতীয় প্রবুদ্ধ মঞ্চ প্রজ্ঞাপ্রবাহের পশ্চিমবঙ্গ শাখা লোকপ্রজ্ঞার উদ্যোগে গত ৩০ এপ্রিল বসু বিজ্ঞান মন্দির সল্টলেক সেক্টর ফাইভে অনুষ্ঠিত হলো স্মরণীয় অনুষ্ঠান— বিজ্ঞানসভা অনুভব দর্শন। উপস্থিত ছিলেন বসু বিজ্ঞান মন্দিরের ডিরেক্টর প্রফেসর উদয় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রফেসর গৌরব বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাবা পরমাণু কেন্দ্রের বিজ্ঞানী ড. দেবব্রত দত্ত, ভোপাল এনআইটি’র পূর্বতন প্রফেসর ড. সদানন্দ সপ্রে, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি ও রাজনীতি বিভাগের পূর্বতন অধ্যাপক ড. প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ আশিস কুমার মণ্ডল।

অনুষ্ঠানে ৩০০ জন বিজ্ঞানী, গবেষক, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯০ জন ছাত্র-ছাত্রী-সহ বিশিষ্ট গুণীজনেরা অংশগ্রহণ করেন। নির্ধারিত সূচি অনুসারে সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত একের পর এক বিজ্ঞানীদের মনোজ্ঞ বক্তব্য সবাই মুগ্ধ হয়ে শুনেছেন। বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে ছিল প্রশ্নোত্তর পর্ব। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন দিগন্ত চক্রবর্তী, সমর্থিতা শাসমল, অস্মিতা চক্রবর্তী এবং প্রণব কুমার নন্দ।

নির্দেশক হিসেবে ছিলেন সুতপা বসাক ভড়, ড. মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নন্দলাল জানা।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রশিক্ষণ বর্গ

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের দশদিবসীয় প্রশিক্ষণ বর্গ গত ১২ মে শুরু হয়েছে ফারাক্কা ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রণবানন্দ বিদ্যাপীঠে। বর্গের উদ্বোধন করেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রমুখ সন্ন্যাসী পূজ্য বাদল মহারাজ। উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন ক্ষেত্রীয় সংগঠন সম্পাদক স্বপন মুখোপাধ্যায়।

বর্গে উত্তরবঙ্গ থেকে ১৫ জন মহিলা-সহ ২৮ জন এবং দক্ষিণবঙ্গ থেকে ১৭ জন মহিলা-সহ ৬৯ মোট ৯৭ জন কার্যকর্তা অংশগ্রহণ করেছেন। ইতিমধ্যে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় সংগঠন সাধারণ সম্পাদক বিনায়করাও দেশপাণ্ডে, প্রবীণ কার্যকর্তা রাঘবলুজী এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সহ প্রচারক প্রমুখ অদ্বৈতচরণ দত্ত বর্গ পরিদর্শন করেছেন। বর্গে মুখ্যশিক্ষক হিসেবে রয়েছেন রামদয়াল বর্মন। বৌদ্ধিক প্রমুখ হিসেবে অশোক কুমার সাহা এবং সর্বব্যবস্থা প্রমুখ হিসেবে সব্যসাচী আগরওয়াল। উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সংগঠন সম্পাদক অনুপ কুমার মণ্ডল, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সংগঠন সম্পাদক বিজয় পাতর এবং ক্ষেত্রীয় সামাজিক সমরসতা প্রমুখ গৌতম কুমার সরকার সর্বসময়ের জন্য উপস্থিত রয়েছেন।

ত্রিপুরা সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গের সমাপন অনুষ্ঠান

গত ১৪ মে ত্রিপুরার পূর্ব চাম্পামুড়াস্থিত সেবাধামে পদ্মশ্রী বিক্রমবাহাদুর জামাতিয়ার প্রধান আতিথ্যে ত্রিপুরা প্রান্তের সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গের সমাপন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ক্ষেত্র সঙ্ঘচালক ডাঃ উমেশ চক্রবর্তী। বিপুল সংখ্যক অতিথি অভ্যাগতের সামনে সাধারণ ও বিশেষ বর্গের শিক্ষার্থীরা শারীরিক কলাকৌশল প্রদর্শন করেন।

অখিল ভারতীয় পূর্ব সৈনিক সেবা পরিষদের রাষ্ট্রীয় কার্যনির্বাহী সমিতির সভা

গত ৩০ এপ্রিল অখিল ভারতীয় পূর্ব সৈনিক সেবা পরিষদের রাষ্ট্রীয় কার্যনির্বাহী সমিতির সভা অনুষ্ঠিত হলো উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ইছাপুর রাইফেল ফ্যাক্টরি মিলনায়তনে। সভায় উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সমিতির সভাপতি, সহসভাপতি, সম্পাদক-সহ সমস্ত সদস্য এবং প্রতিটি রাজ্যের রাজ্য সভাপতি, সম্পাদক ও সংগঠন সম্পাদক। উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও মহারাষ্ট্রের জেলা সভাপতি ও সম্পাদকরা বিশেষভাবে আমন্ত্রিত ছিলেন। শ্রীমতী মায়া কাউলের নেতৃত্বে ৫ জন মহিলা সদস্যও উপস্থিত ছিলেন। আগত প্রতিনিধিদের থাকার ব্যবস্থা ছিল অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরিজ ইনস্টিটিউট অব লার্নিং আবাসনে।

নির্ধারিত সময় অনুযায়ী সকাল ৯টায় প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে সভার শুভারম্ভ হয়। মঞ্চাসীন ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সম্পর্ক প্রমুখ প্রদীপ যোশী,সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি লেফটেন্যান্ট জেনারেল ডি কে চতুর্বেদী। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সভাপতি কর্নেল কুণাল ভট্টাচার্য সম্মাননীয় অতিথিদের উত্তরীয় পরিয়ে বরণ করে নিয়ে, ফুলের তোড়া ও ৪৫তম কার্যনির্বাহী সভার জন্য প্রস্তুত মেমেন্টো প্রদান করা হয়। এরপর পরিবেশিত হয় সরস্বতী বন্দনা এবং বন্দে মাতরম্ নৃত্য আবৃত্তি। ঘোষক হিসেবে ছিলেন টিটাগড়ের শ্রীমতী জ্যোতিষ্কা।

তারপর শুরু হয় কার্যনির্বাহী সভা। প্রতিটি রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক তাদের বার্ষিক প্রতিবেদন পাঠ করেন। সেইসঙ্গে রাজ্যে সম্পন্ন বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরণ উল্লেখ করেন। এই সভা পরিচালনা করেন ব্রিগেডিয়ার ডি এস ত্রিপাঠী। কার্যনির্বাহী সমিতির সদস্য সুনীল দেশপাণ্ডের ধন্যবাদ

জ্ঞাপনের পর সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। তারপর ব্যারাকপুর পদাতিক ব্যাটালিয়ান স্পোর্টস গ্রাউন্ডে এক চা-চক্রের আয়োজন করা হয়। তাতে কমান্ডার ও উর্ধ্বতন পর্যায়ের পদাধিকারীরা অংশগ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য, ২৯ এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস রাজভবনে পূর্ব সৈনিক সেবা পরিষদের কয়েকজন পদাধিকারীকে মধ্যাহ্নভোজনে আমান্ত্রণ জানান। তাঁর আমন্ত্রেণে সাড়া দিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল বিষ্ণুকান্ত চতুর্বেদী, এয়ার ভাইস মার্শাল হরবন্স পারমিন্দর সিংহ এবং কর্নেল কুণাল ভট্টাচার্য। এছাড়াও ছিলেন জিওসি বেঙ্গল সাব এরিয়া এবং জিওসি-ইনসি পূর্ব কমান্ড। অখিল ভারতীয় পূর্ব সৈনিক সেবা পরিষদের পক্ষ থেকে রাজ্যপাল মহোদয় এবং তাঁর সহধর্মিণীকে শাল উপহার দেওয়া হয়।

আচার্য বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী স্মৃতি ব্যাখ্যানমালা

বড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের উদ্যোগে গত ৩০ এপ্রিল স্থানীয় অসোয়াল ভবনের প্রেক্ষাগৃহে আচার্য বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী স্মৃতি ব্যাখ্যানমালার ১৮তম ব্যাখ্যানের আয়োজন করা হয়। এবারের ব্যাখ্যানের বিষয় ছিল 'হিন্দি বাল সাহিত্য ঃ সম্ভাবনা এবং চ্যালেঞ্জ'। বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বালপ্রভা বার্ষিকের সম্পাদক, কাব্য বীণা সম্মানে ভূষিত, বিশিষ্ট বাল সাহিত্যিক নাগেশ পাণ্ডে। তিনি বলেন, 'ছোটোদের মানসিক বিকাশ ও চরিত্র গঠনে বাল সাহিত্যের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। শুধু ছোটোদের জন্যই নয়, বাবা-মায়ের জন্যও বাল সাহিত্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, তাঁদেরও এক সময় ঠাকুমা-ঠাকুরদার ভূমিকা পালন করে ছোটোদের সংস্কারিত করার কাজ করতে হবে।' সেই সঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন, আচার্য বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী ছিলেন ভারতীয় সংস্কৃতির শলাকাপুরুষ। তাঁর মন বালকের মতো নিষ্কলুষ ছিল।' সভাপতিত্ব করেন উত্তর প্রদেশ হিন্দি সংস্থান, লক্ষ্ণৌয়ের প্রধান সম্পাদিকা ড. অমিতা দুবে। অনুষ্ঠানের শুরুতে বিশিষ্ট গায়ক ওমপ্রকাশ মিশ্র আচার্য শাস্ত্রীরচিত রামবন্দনা সংগীতাকারে পরিবেশন করেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ড. ঋষিকেশ রায়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন যোগেশরাজ উপাধ্যায়, ধন্যবাদ জানান ড. প্রেমশঙ্কর ত্রিপাঠী।

সল্টলেকে ক্রীড়া ভারতীর খেল মহোৎসব

ক্রীড়া ভারতী কলকাতা মহানগরের উদ্যোগে সল্টলেক স্পোর্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়ার প্রাঙ্গণে এবং লায়ন ক্লাবস

ইন্টান্যাশনাল ডিস্ট্রিক্ট 322B2-এর সহযোগিতায় গত ৫,৬,৭ মে তিন দিবসীয় খেল মহোৎসবের আয়োজন করা হয়। ৫ মে যোগাসন, ৬ মে কাবাডি এবং ৭ মে ফুটবল এবং কুংফু ও ক্যারাটে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ৭০০ জন কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। তিনদিন ব্যাপী এই খেল মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়া ভারতীর রাষ্ট্রীয় সহ সম্পাদক মধুময় নাথ, ক্ষেত্রীয় সংযোজক ড. পার্থ বিশ্বাস, প্রান্ত অধ্যক্ষ দেবাশিস বিশ্বাস, কলকাতা মহানগর সচিব সঞ্জয় মণ্ডল, রাষ্ট্রীয় কার্যকারিণীর সদস্য বিভাস মজুমদার, বিশ্বরঞ্জন দাস, মৃদুল ব্যানার্জি, লায়নস ক্লাবস ইন্টান্যাশনাল ডিস্ট্রিক্ট 322B2-এর ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর আনন্দ জৈন, পূর্ব ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর কিশন কুমার পোদ্দার, বিজয় জোধানী, পবন গুপ্তা, রাজেশ আগরওয়াল (লালা), প্রদীপ আগরওয়াল, অশোক জয়সোয়াল, সন্দীপ জৈন, প্রবীর ঘোষাল, শ্রীমতী জয়ন্তী মণ্ডল সরকার, বাবুল চন্দ্র দাস, ঘনশ্যাম চৌরাসিয়া প্রমুখ। অতিথিবৃন্দ প্রতিযোগীদের বড়ো খেলোয়াড় হয়ে দেশের জন্য খেলার প্রেরণা দেন। সমস্ত প্রতিযোগীকেই পুরস্কার ও শংসাপত্র দিয়ে সম্মানিত করা হয়।

হিন্দু সাম্রাজ্যদিনোৎসব ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল অধ্যায়

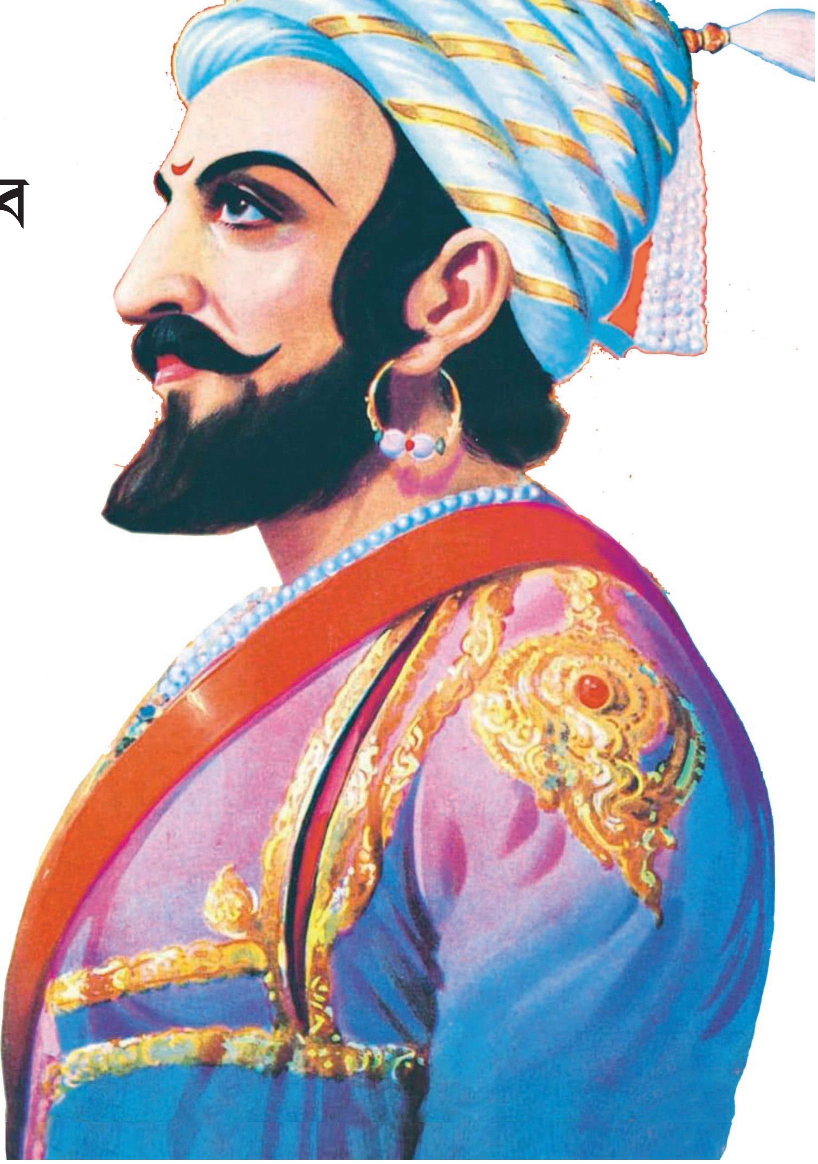

প্রবীর কুমার মিত্র

জ্যৈষ্ঠ শুক্ল ত্রয়োদশী ভারতের ইতিহাসের অত্যন্ত পবিত্র দিবস। এই তিথিতেই আজ থেকে ৩৪৯ বছর আগে হিন্দুরাজ্যের পুনরুত্থানের নায়ক ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছিল। জাতীয় নবজাগরণের একটি বৈশিষ্ট্য হলো অতীতের মহান কাজের বার বার স্মরণ করা। শিবাজীকে সামনে রেখে জাতীয় পুনরুত্থানের চেষ্টা ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে লক্ষ্য করা যায়। লোকমান্য তিলক জাতীয় জাগরণকে ত্বরান্বিত করার জন্য সারাদেশে 'শিবাজী উৎসব' প্রচলন করেছিলেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচনা করেছিলেন 'শিবাজী উৎসব' কবিতা। শিবাজীর সংগ্রামী জীবন ও নিষ্কলঙ্ক চরিত্র থেকে নিরন্তর প্রেরণা গ্রহণের জন্য রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা প্রাতঃস্মরণীয় কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার (ডাক্তারজী) সঙ্ঘে অনুষ্ঠিত ছয়টি উৎসবের মধ্যে হিন্দু সাম্রাজ্যদিনোৎসব প্রবর্তন করেছিলেন। শিবাজীর রাজ্যাভিষেক দিবস প্রতি বছর জ্যৈষ্ঠ শুক্ল ত্রয়োদশীতে পালিত হয়। এই বছর ২ জুন ২০২৩ তারিখে পালন করা হবে।

শিবাজীর রাজ্যাভিষেক দিবস হিন্দু সমাজের কাছে এক মহত্ত্বপূর্ণ দিবসরূপে ইতিহাসের এক উজ্জ্বল অধ্যায়। এই উৎসব আত্মবিশ্বাস, গৌরবানুভূতি, পরাক্রম, স্বাভিমান এবং বিজয় প্রবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত। হিন্দুকুলগৌরব ছত্রপতি শিবাজীর সিংহাসন আরোহণ উপলক্ষ্যে হিন্দুসাম্রাজ্য দিনোৎসব পালিত হয়। পূর্ণ শাস্ত্রীয় বিধি মেনে শিবাজীর রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। শিবাজীর মাতা জিজাবাঈয়ের প্রেরণার পরিণাম ছিল এই রাজ্যাভিষেক। বিজিগীষু বৃত্তি, পুরুষার্থ, রাষ্ট্রভাব এবং আত্মগৌরববৃত্তি জাগরণ, পরাভূত মানসিকতার পরিবর্তন, সংযম ও সৌহার্দ্যভাব নির্মাণের প্রতীক ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের রাজ্যাভিষেক জ্যৈষ্ঠ শুক্ল ত্রয়োদশীতে (বিক্রম সংবৎ ১৭৩১ খ্রি: ১৬৭৪) সম্পন্ন হয়েছিল। এইদিন হিন্দুপদপাদশাহির স্থাপন হয়েছিল। হিন্দুসাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করে শিবাজী সমগ্র বিশ্বে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ভুল ধারণা দূর করেছিলেন।

শিবাজী মহারাজের জীবনে মাতা জিজাবাঈয়ের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। সেইজন্য শিবাজীকে জানার পূর্বে মাকে জানা উচিত। শিবাজী নিজের মাকে মিত্র, পথপ্রদর্শক ও প্রেরণার কেন্দ্রবিন্দু মনে করতেন। অল্প বয়সেই শিবাজী নিজের সমাজ ও কর্তব্য সম্পর্কে বুঝে গিয়েছিলেন। সেইজন্য মায়ের পথনির্দেশে হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রয়াস অল্প বয়সেই শুরু করেছিলেন। জিজাবাঈ হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপনের জন্য এমন গল্প শোনাতেন যাতে শিবাজীর মনে ধর্ম ও কর্ম সম্পর্কে বোধ জাগ্রত হয় এবং লোকেদের কীভাবে রক্ষা করতে হবে সেই সম্বন্ধে জ্ঞান হয়।

ফলস্বরূপ মাত্র সতেরো বছর বয়সে সৈন্যবাহিনী গঠন করেছিলেন এবং পরাক্রম দ্বারা বিজয়

প্রাপ্ত করেছিলেন। জিজাবাঈয়ের সংস্কার দ্বারা নির্মিত হয়েছিলেন ছত্রপতি শিবাজী। নিজের জীবনের কষ্ট ভুলে জিজামাতা শিবাজীকে এমন শিক্ষা ও সংস্কার দিয়েছিলেন যাতে শিবাজী নিজের জন্য নয়, অপরের জন্য জীবন শুরু করেছিলেন। নিজের ধর্মের জন্য লড়াই শুরু করেছিলেন। যার ফলস্বরূপ শিবাজীর গৌরবগাথা আজ আমরা স্মরণ করছি, তাঁকে ছত্রপতি শিবাজী নামে সম্বোধিত করছি। জিজাবাঈ এমন মহিলা ছিলেন যাঁকে দূরদর্শিতা ও যুদ্ধনীতির জন্য স্মরণ করা হয়। তিনি সব সময় মহিলাদের রক্ষা ও সম্মান রক্ষায় কথা ভেবেছেন এবং শিবাজীকেও শিখিয়েছেন। জিজাবাঈয়ের অন্য পুত্রকে আফজল খাঁ হত্যা করেছিল। বদলা নেওয়ার জন্য জিজাবাঈ শিবাজীকে প্রেরণ করেছিলেন। শিবাজী জিজাবাঈয়ের কাছ থেকে অনেক যুদ্ধনীতি শিখে অনেক যুদ্ধ জয় করেছিলেন। শিবাজীর রাজ্যাভিষেকের বারো দিন পরে জিজাবাঈয়ের মৃত্যু হয়। হিন্দুত্বের স্বপ্ন সাকার হতে দেখে গিয়েছিলেন। ধর্মপরায়ণ মায়ের প্রভাব শিবাজীর জীবনে গভীর রেখাপাত করেছিল। রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনি শুনে শিশুকালেই শিবাজী বীরত্ব ও দেশপ্রেমের আবেগে মথিত হয়েছিলেন। শিবাজী ছিলেন মা ভবানীর পূজক এবং নিজের মাতৃদেবী জিজাবাঈয়ের প্রতি অনুগত ও একান্ত শ্রদ্ধাশীল। মাতা জিজাবাঈয়ের সঙ্গে মন্দিরে যাওয়া শিবাজীর নিত্য নৈমিত্তিক কাজ ছিল। সেখানে দেবদর্শন ও রামায়ণ ও মহাভারতের পাঠ শোনা ছিল তার প্রিয় কাজ ছিল।

শিবাজী মহারাজের সম্পূর্ণ চরিত্র হিন্দু সমাজের কাছে আজও মূর্তিমান আদর্শ। শিবাজী মহারাজের দ্বারা সমগ্র দেশের জন্য কিছু করার প্রয়াসের সফল পরিণতি হলো তাঁর রাজ্যাভিষেক। এইজন্য শিবাজী উৎসব না বলে হিন্দু সাম্রাজ্য দিনোৎসব বলা হয়। শিবাজী মহারাজের চরিত্র, নীতি, কুশলতা ও উদ্দেশ্যর পবিত্রতা আজও সমান প্রাসঙ্গিক। সেই সময় পরিস্থিতি ছিল হিন্দু সমাজের কেউ সৈনিক, সর্দার অথবা সেনাপতি হতে পারে কিন্তু রাজা হতে পারেন না। এই বিপরীত পরিস্থিতিতে শিবাজী হিন্দু সমাজের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগিয়েছিলেন। হিন্দুও যে রাজা হতে পারে তা তিনি সার্থক করেছিলেন। সীমিত সাধনের দ্বারা তিনি প্রমাণ করেছিলেন হিন্দুরাও শ্রেষ্ঠ, স্বতন্ত্র এবং নিজে শাসক হবার যোগ্য। সাধারণ ব্যক্তির মধ্যে অসাধারণ প্রতিভা জাগিয়ে রাষ্ট্রনির্মাণের কুশল নেতৃত্ব তৈরি করেছিলেন।

হিন্দু সমাজের জন্য প্রেরণাদায়ী হিন্দু সাম্রাজ্য তিনি স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু তখনও পর্যন্ত শাস্ত্র অনুসারে বিধিবদ্ধ সিংহাসন আরোহণ হয়নি। এই জন্য কেউ কেউ শিবাজীকে রাজা মানতে অস্বীকার করে। শিবাজীর জীবনের এই ত্রুটি দূর করার জন্য কাশীর বিদ্বান পণ্ডিত গাগা ভট্ট এগিয়ে আসেন, শাস্ত্র অনুসারে শিবাজীর রাজ্যাভিষেক হয়। তখন শিবাজীর বয়স ৪৪ বছর। দুর্গম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ রায়গড় দুর্গে রাজধানী স্থাপন করা হয়। মাতা জিজাবাঈয়ের চরণ স্পর্শ করে, তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে শিবাজী রত্নখচিত স্বর্ণসিংহাসনে আসীন হন। গাগাভট্ট শিবাজীর মস্তকে স্বর্ণছত্র স্থাপন করে শিবাজীকে ছত্রপতি শিবাজী ঘোষণা করেন। মহিলারা আরতি করেন। সাধুসন্তরা আশীর্বাদ করেন। দূরদূরান্ত থেকে আগত অতিথিরা আনন্দেবিভোর হয়ে মুক্তকণ্ঠে জয়ধ্বনি করেন 'ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ কী জয় হো।' রায়গড় দুর্গ থেকে তোপ দাগা হয়। বিজাপুরের সুলতান এবং ইংরেজরা শিবাজীকে স্বতন্ত্র রাজা হিসেবে মান্যতা প্রদান করে উপঢৌকন পাঠায়। এই ঘটনা দেখে আনন্দবিহ্বল সমর্থ স্বামী রামদাস বলে উঠেন 'এই ভূমির উদ্ধার হলো। ধর্মের উদ্ধার হলো। আনন্দময় স্বরাজ্যের উদয় হলো।'

শিবাজী যুগপুরুষ ছিলেন। প্রতিকূল পরিস্থিতিকে অনুকূল পরিস্থিতিতে রূপান্তরিত করেছিলেন। হিন্দু সমাজে নব চৈতন্য সঞ্চার করেছিলেন। হিন্দু সমাজের নৈরাশ্য দূর করেছিলেন। হিন্দু সমাজকে স্বাভিমানহীনতা ও আত্মগ্লানি থেকে মুক্ত করেছিলেন। মুসলমান সাম্রাজ্যের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছিলেন। হিন্দুধর্ম, সংস্কৃতি, গোমাতা, ব্রাহ্মণ, মা-ভগিনীর রক্ষার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। শিবাজীর নিজের পৌরুষের দ্বারাই হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। সিংহাসনে আরোহণ করার পিছনে শিবাজীর ক্ষমতালিপ্সা ছিল না। শিবাজী স্বয়ং রাজ্যের প্রতি অনাসক্ত ছিলেন। সম্পূর্ণ রাজ্য ছেড়ে তুকারামের সঙ্গে হরিসংকীর্তনে সমস্ত জীবন উৎসর্গ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। সম্পূর্ণ রাজ্য তো তিনি গুরুদক্ষিণা রূপে সমর্থ স্বামী গুরু রামদাসের চরণে উৎসর্গ করেছিলেন।

শিবাজীর জীবন ধর্মনিষ্ঠ ছিল কিন্তু অন্ধবিশ্বাসে পূর্ণ ছিল না। যোগ্য লোকসংগ্রাহক ছিলেন কিন্তু অনাবশ্যক তুষ্টিকরণ নীতিতে বিশ্বাস ছিল না। কর্তব্যে কঠোর ছিলেন কিন্তু ক্রূর ছিলেন না। শিবাজী অত্যন্ত কুশল যোদ্ধা ছিলেন। নিজের ছোটো সেনাদল দ্বারা বিশাল সেনাদলকে ধ্বংস করার কৌশল তার জানা ছিল। তিনি গেরিলা যুদ্ধের জনক ছিলেন। শিবাজী মহারাজের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের তৃতীয় সরসঙ্ঘচালক বালাসাহেব দেওরস বলেছেন, 'শিবাজী মহারাজের শ্রেষ্ঠত্ব কেবল যুদ্ধে নেতৃত্ব দানের মধ্যেই সীমিত ছিল না। সারাটা জীবন যুদ্ধক্ষেত্রে কাটানো সত্ত্বেও তাঁর প্রশাসনিক ব্যবস্থা এত সুষ্ঠু ও সুন্দর ছিল যে তা ভাবতেও অবাক লাগে। ব্যবসা, বাণিজ্য, কৃষি, রাজস্ব আদায় প্রভৃতি সব ব্যাপারেই ছিল সুব্যবস্থা। এমনকী দেশের উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কথা পর্যন্ত তিনি ভেবেছিলেন। হিন্দু জীবনাদর্শে রাজার যে আসন ও মর্যাদা চিহ্নিত আছে সব কষ্টিপাথরে বিচার করলে শিবাজী ছিলেন আদর্শ রাজা। তাঁর রাজ্যে প্রজার উপর কোনো উৎপীড়ন ছিল না।' শিবাজীর রাজত্বে এক সফল ও আদর্শ শাসন ছিল। তাঁর সাম্রাজ্যে প্রজারা সন্তুষ্ট ছিল। আধুনিক ভারতে যে কয়েকজন শাসক প্রজা কল্যাণকারী শাসন ব্যবস্থা প্রণয়ন করে সুশাসনের আদর্শ উদাহরণ রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন তাদের মধ্যে নিঃসন্দেহে শিবাজী অন্যতম। মুঘল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সেই সময়ে মান-ধন রক্ষা করাই যেখানে দেশীয় রাজাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল, সেখানে অতি সুন্দর শক্তিশালী শাসন ব্যবস্থা প্রণয়ন সত্যিই আশ্চর্যের। কিন্তু শিবাজী তা করে দেখিয়েছেন। একদিকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রাজ্য রক্ষা, অন্যদিকে প্রজার কল্যাণ সাধন; এই দুইকেই দক্ষতার সঙ্গে সামলেছেন তিনি।

পরাধীন ভারতে স্বাধীনতা যুদ্ধে অনেক দেশভক্ত শিবাজীর জীবন থেকে প্রেরণা পেয়েছেন। নেতাজীর জীবনও শিবাজীর জীবন দ্বারা প্রভাবিত ছিল। নেতাজী বলেছেন— 'ভারতীয়দের সামনে স্বাধীনতা যুদ্ধে সফলতা লাভের জন্য শিবাজীর উদাহরণ রাখা উচিত'। অভিনব ভারত দলের সদস্যরা শিবাজীর চিত্রের সামনে শপথ নিতেন। শিবাজীর সাম্রাজ্যের শক্তির মূল উৎস ছিল বিভিন্ন মরাঠা সেনাপতিদের নিয়ে গঠিত মরাঠারাজ্য সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা। আচার্য যদুনাথ সরকারের মতে, 'শিবাজী পরমাণুর মতো বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত মরাঠা জাতিকে একটি শক্তিমান জাতিতে রূপান্তরিত করেছিলেন এবং তিনিই আধুনিক আত্মসচেতন হিন্দু জাতির পূর্ণ অভিব্যক্তি লাভের দীক্ষাদাতা।' □

রাষ্ট্রনায়ক ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ

দীপক খাঁ

সমগ্র ভারতবর্ষের ইতিহাসে এবং রাজনীতিতে শিবাজীর রাষ্ট্রভাবনার যে গুরুত্ব রয়েছে তা বারবার স্বীকৃতি লাভ করেছে। বালগঙ্গধর তিলক, মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ শিবাজীর সর্বভারতীয় ঐক্যবিধায়ক রাষ্ট্রচিন্তাকে সম্মান জানিয়েছেন। যে বিষয়টি নিয়ে দ্বন্দ্ব তা হলো তিনি সর্বধর্মবোধকে আদর্শ হিসাবে মানতেন কি মানতেন না। অনেকেই মনে করেন তিনি উগ্র হিন্দুত্বের চিন্তাকে প্রশ্রয় করে স্বরাজ্য স্থাপনের কথা চিন্তা করেছিলেন। অনেকে আবার মনে করেন তিনি হিন্দুধর্মের প্রতি গভীর আসক্তি থাকা সত্ত্বেও মুসলমানদের বিরুদ্ধাচরণ করেননি। তাঁর তীব্র বিরোধিতা ছিল হিন্দুধর্মবিদ্বেষী গোঁড়া মুসলমানের বিরুদ্ধে। এই দুই ভাবনাকে কেন্দ্র করে দ্বন্দ্বের শেষ নেই। মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে 'শিবসেনা'র যে ভূমিকা তাঁর আদর্শ ও বাস্তব চরিত্র বিশ্লেষণে শিবাজীর আদর্শ ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির কথা প্রাসঙ্গিক ভাবে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। রাজনৈতিক দল 'শিবসেনা' কিন্তু 'শিবাজীসেনা' বলেই নিজেদের ভাবতে ভালোবাসে।

শিবাজীর সমসাময়িক মরাঠি কবি, সাহিত্যিক ও রাজনীতিজ্ঞদের কাছে শিবাজী যে তাঁদের শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলে পূজিত হতেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'শিবাজী উৎসব' কবিতায় শিবাজীকে নতুন ভারতবর্ষের প্রাণের উদ্‌গাতা হিসেবে দেখেছেন। ঘূর্ণায়মান কালচক্রে বঙ্গ ও মরাঠা ঐক্যবদ্ধ হতে চেয়েছে এবং সেক্ষেত্রে ঐক্যবিধায়ক শক্তির আদর্শ শিবাজীর আদর্শের থেকেই গৃহীত হয়েছে। রাজা হিসেবে প্রজার মঙ্গলসাধনের ব্রতকেই রবীন্দ্রনাথ শ্রদ্ধায় বরণ করেছেন তাঁর কবিতায়।

১৯১১ সালে রবীন্দ্রনাথ 'মর্ডান-রিভিউ'তে লিখলেন : 'Shivji...introduced the Maratha race on the stage of history after having clearly formed in his mind the ideal of setting up a 'Hindu Empire' and that Shivaji's wars were the well connected steps of a ladder, they were not mere outbursts of passions, not mere wrangles' মরাঠিদের কাছে শিবাজী কেবল মহারাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় চরিত্র নন, তিনি সমগ্র ভারতবর্ষের নায়ক চরিত্র। লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক শিবাজীর মধ্যে পরাধীন ভারতবর্ষের মুক্তিকামী মানুষের মুক্তির দিশারিকে খুঁজে পান। শিবাজী উৎসবের মধ্য দিয়ে বালগঙ্গাধর ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের যুবশক্তিকে উদ্‌বোধিত করবার চেষ্টা করেন। তিনি শিবাজীকেই স্বাধীনতাকামী ভারতবাসীর আদর্শগত নেতা হিসেবে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। ১৮৯৬-এ প্রথম শিবাজী উৎসব পালিত হয়। শিবাজীর মুসলমান বিরোধিতাকে অত্যাচারী বিদেশি শাসকের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিবাদ হিসেবে দেখিয়েছেন তিলকজী। শিবাজী আফজল খাঁকে বিশ্বাসঘাতকের মতো হত্যা করেছিলেন, না আফজল খাঁ বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন বলেই নিজেকে রক্ষা করবার জন্য শিবাজী তাকে হত্যা করেন— এই বিতর্কের মীমাংসা তিলক করেছেন ভগবতগীতার উক্তি দিয়ে। তিনি তাঁর 'কেশরী' পত্রিকার সম্পাদকীয়তে লেখেন যে শ্রীকৃষ্ণ যেমন ভাবে অর্জুনকে

বুঝিয়েছিলেন যে নিষ্কাম কর্ম সম্পাদনের জন্য আপন আত্মীয়-স্বজনদের হত্যা করাও অপরাধ নয়, তেমনি মহৎ কর্মে ব্রতী হয়ে যাঁরা স্বার্থশূন্য হয়ে অন্যকে হত্যা করে তাঁদের কাজটা আমাদের ক্ষুদ্র চিন্তাধারায় বিচার করা ঠিক হবে না। অর্থাৎ আফজল খাঁকে যদি শিবাজী বিনা প্ররোচনায় হত্যা করে থাকেন তা হলেও বুঝতে হবে মহত্তর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে তিনি সে কাজ করেছিলেন।

শিবাজীর মধ্যে তিনি দেশের মুক্তিকামী বিপ্লবীদের আদর্শকে খুঁজে পেয়েছিলেন। শিবাজী যেভাবে পররাষ্ট্রলোভী অত্যাচারী মুসলমান শাসক ও শোষকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তিলক যেন সেইভাবেই ব্রিটিশ বিরোধিতা করার জন্য সমগ্র জাতির প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন। শুধু বিদেশি শাসকের বিরোধিতার জন্য নয়, পাশ্চাত্যের ভোগসর্বস্বতার বিপরীতে শিবাজীর আদর্শকে তুলে ধরেছেন। ছত্রপতি রাজা শিবাজী যেন এক ত্যাগী যোগীপুরুষ। ত্যাগের যে মহান আদর্শ হিন্দুধর্মের প্রাণ, সেই আদর্শের পতাকা ভারতবর্ষের বুকে তুলে ধরেছেন শিবাজী। তাই শিবাজীকে ভারতবাসীর পথপ্রদর্শক হিসেবে তুলে ধরে তিলক সমগ্র ভারতে এক নতুন জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছিলেন।

শিবাজী সম্পর্কে স্যার যদুনাথ সরকার মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন যে শিবাজীর উত্থান হিন্দুধর্মের অমরত্বের প্রমাণ। প্রখ্যাত ঐতিহাসিকের এই মূল্যায়ন তাৎপর্যমণ্ডিত। শিবাজীর ধর্মরাজ্য স্থাপন বা স্বরাজ্য স্থাপনকে আধুনিক যুগের তথাকথিত ঐতিহাসিকরা বড়ো একটা গুরুত্ব দিতে চান না। আন্দ্রে উইঙ্ক-এর মতো অধ্যাপকরা শিবাজীর হিন্দুরাজ্য স্থাপনের প্রয়াসকে সামগ্রিকভাবে বিশাল মুঘল সাম্রাজ্যের দাক্ষিণাত্য নীতির ফলশ্রুতি হিসেবেই দেখাতে চেয়েছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শিবাজীর কৃতিত্বকে ছোটো করে দেখেননি। শুধু তাই নয়, তাঁর সাফল্যের মূলে যে তাঁর সঙ্গে অনুগামী মানুষের একাত্মবোধ বড়ো ভূমিকা পালন করেছিল, তা তিনি অকপটে স্বীকার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ কালান্তরে 'স্বামী শ্রদ্ধানন্দ' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন : 'শিবাজী এক সময় ধর্মরাজ্য স্থাপনের ভিত গড়েছিলেন। তাঁর যে অসাধারণ শক্তি ছিল তা দ্বারা তিনি মরাঠাদের একত্র করতে পেরেছিলেন। সেই সম্মিলিত শক্তি ভারতবর্ষকে নিরুপদ্রুত করে তুলেছিল। অশ্বের সঙ্গে অশ্বারোহীর যখন সামঞ্জস্য হয়, কিছুতেই সে অশ্ব থেকে পড়ে না, শিবাজীর হয়ে সেদিন যারা লড়েছিল তাদের সঙ্গে শিবাজীর তেমন সামঞ্জস্য হয়েছিল। পরে আর সে সামঞ্জস্য রইল না। পেশোয়াদের মনে ও আচরণে ভেদবুদ্ধি, খণ্ড খণ্ড স্বার্থবুদ্ধি তীক্ষ্ণ হয়ে ক্ষণকালীন রাষ্ট্রবন্ধনকে টুকরো টুকরো করে দিল।'

বীর সাভারকার আন্দামানের জেলে বসে শিবাজী সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছিলেন তাঁর ভাবনার সঙ্গে আজও অনেকে একমত। তিনি শিবাজী সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করতেন তা হলো : 'Shivaji thought to himself— we are Hindus. The Mahammadans have subjugated the entire deccan they have defeated our sacred places! In fact they have desecrated our religion and for that we would even lose our lives. We will acquire new kingdoms by our own power and that bread we will eat.'

একথা ঠিক যে শিবাজী ঔরঙ্গজেবকে জিজিয়া কর বসানোর বিরুদ্ধে যে চিঠি দেন তাতে তিনি আকবরের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন এবং সব ধর্মের প্রতি সহনশীলতার আদর্শকে তুলে ধরেছিলেন। এই গুরুত্বপূর্ণ পত্রে শিবাজী ধর্মীয় গোঁড়ামির তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। শুধু তাই নয়, ঔরঙ্গজেবকে এই পত্রে তিনি যেমন অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে নিজের কথা বলেছেন তেমনি তাঁর আর্থিক দুরবস্থা এবং ধর্মীয় গোঁড়ামি নিয়ে উপহাস করতে ছাড়েননি। ঔরঙ্গজেবের বিশাল মুঘল সাম্রাজ্যের যখন প্রবল প্রতাপ, তখন এই ধরনের বিদ্রূপাত্মক পত্র শিবাজী ছাড়া আর কারও পক্ষে দেওয়া সম্ভব ছিল না। এই পত্রে ধর্মীয় সহনশীলতার কথা বারবার বললেও শিবাজীর হিন্দুধর্মের গুরুত্ব এবং মহানুভবতার কথা দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যক্ত করে গেছেন। এই পত্রখানি একজন হিন্দু রাজার মুসলমান সম্রাটের কাছে পত্র না বলে, একজন হিন্দুধর্ম রক্ষকের ক্ষমতাসীন শাসকের ধর্মের প্রতি আঘাতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদপত্র বলাই ভালো। □

স্বস্তিকা
পড়ুন ও পড়ান
গ্রাহক হোন, গ্রাহক করুন

এই বামপন্থা কোথা হইতে আসিল?

আনন্দ মোহন দাস

বামপন্থা শব্দটি আমাদের দেশে বহু চর্চিত হলেও অনেকেই জানেন না যে এই বামপন্থা কী এবং কোথা থেকে আমদানি হলো। এমনকী যাঁরা নিজেদের গর্বভরে বামপন্থী বলে ভাবেন তাঁরাও না। আসলে শব্দটি আমরা পেয়েছি ব্রিটিশদের কাছ থেকে। সে দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দুটি সুস্পষ্ট রাজনৈতিক দল রয়েছে। একদিকে ডেমোক্র্যাট তথা রক্ষণশীল দল এবং অন্যদিকে লেবার পার্টি যাঁদের লিবারেল বা সমাজতান্ত্রিকও বলা হয়। নির্বাচনে জয়ী হয়ে যে দল সরকার গঠন করে পার্লামেন্টে সেই দলের সদস্যরা স্পিকারের ডান দিকে বসেন এবং বিরোধীরা বসেন তাঁর বাম দিকে। সেখানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ডেমোক্র্যাটরা জয়ী হন এবং ডানদিকের আসনে বসেন এবং বিরোধী সোশ্যালিস্টরা বসেন বাম দিকে। তবে যখন কখনও সোশ্যালিস্টরা জিতেছেন তখন তাঁরা ডান দিকেই বসেছেন।

তবুও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিরোধী দল হিসেবে বামদিকে বসার কারণে বামদিকটা তাঁদের পেছনে পাকপাকি ভাবে লেগে যায় এবং রাজনীতিতে তাঁরা 'লেফট্' হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। আমাদের দেশে বাম বলতে বোঝায় কমিউনিস্ট ও তাঁদের সহযোগীদের। এখানে এটা স্পষ্ট করে নেওয়া আবশ্যক যে, নীতি আদর্শ এবং তার অনুশীলনে ব্রিটেনের সোশ্যালিস্টরা আমাদের কমিউনিস্টদের মতো নন একেবারেই। তবুও তুলনা করতে গেলে অল্প কিছু সাদৃশ্যের নিরিখে এই কমিউনিস্টদের বামপন্থী বলা হয়।

ব্রিটেনের সোশ্যালিস্টদের সঙ্গে আমাদের দেশের কমিউনিস্টদের

পার্থক্য বুঝতে হলে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জন্মের ইতিহাস জানা প্রয়োজন। দুর্ভাগ্য, আমাদের কমিউনিস্টদের অনেকেই সেটা জানেন না। ইসলাম ও ইসলামের ইতিহাস জানা না থাকলে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জন্মের ইতিহাস বুঝতে একটু অসুবিধা হতে পারে।

ধর্মকে আফিম বললেও ভারতের কমিউনিস্টরা ইসলামের মধ্যে অমৃত আস্বাদন করছেন আর প্রবল ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়াচ্ছেন শুধু হিন্দুদের প্রতি। মাওবাদী, নকশালবাদী-সহ সমস্ত বাম দলই ছদ্মবেশী জিহাদি।

প্রায় আটশো বছর ভারত আরবীয় উপনিবেশ তথা ইসলামের পদানত ছিল। ইসলামি বিশ্ব পয়গম্বর মহম্মদের উত্তরসূরি এক খলিফার অধীন। যদিও এই খলিফার পদ নিয়ে বিস্তর দ্বন্দ্ব, বিবাদ ও রক্তপাত হয়েছে। তবুও ভারতের সব মুসলমান শাসকই তুরস্ক, বাগদাদ, কোনো না কোনো খলিফার অধীন ছিলেন। এক সময় ভারতে তাঁদের সাম্রাজ্য ব্রিটিশ অধিকারে চলে যায়। এতে ভারতের মুসলমানরা ব্যথিত হলেও ইসলামিক খিলাফত তাদের মনোবল সমুন্নত রেখেছিল এবং তারা তাদের সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারে নিরন্তর সচেষ্ট ও সক্রিয় ছিল। সর্বশেষ ইসলামিক খিলাফত ছিল তুরস্ককেন্দ্রিক যা অটোমান সাম্রাজ্য নামে পরিচিত।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে এই তুরস্ক ছিল জার্মানির পক্ষে। যুদ্ধে পরাজিত হলে এই অটোমান সাম্রাজ্য ভেঙে যায় এবং তার অধীন সমস্ত আরব তথা

ফঃ ৫

মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি স্বাধীনতা ঘোষণা করে। খলিফা পদচ্যুত হন এবং কামাল পাশা (আতাতুর্ক) তুরস্কের নতুন নেতা হিসেবে উঠে আসেন। এই ঘটনা ভারতের মুসলমানদের বুকে শেলের মতো বিঁধেছিল। ফলশ্রুতি হিসেবে ভারতে তারা চরম সহিংস ও সাম্প্রদায়িক 'খিলাফত আন্দোলন' শুরু করে। আমাদের স্কুলপাঠ্য ইতিহাসে এই খিলাফত আন্দোলনের নামটিরই শুধু উল্লেখ আছে। এর কারণ এবং প্রকৃতি সম্পর্কে কিছুই জানানো হচ্ছে না। তুরস্কের খলিফা পদচ্যুত হয়েছেন, ভেঙে গেছে তাঁর সাম্রাজ্য, সেই দুঃখে ও ক্ষোভে ভারতের ক্রুদ্ধ মুসলমানরা হিংসা ও নাশকতায় লিপ্ত হয়েছেন এবং তাদের আক্রমণের লক্ষ্য ছিল হিন্দুরা।

এর চেয়েও হতবাক করার মতো আচরণ করেন গান্ধীজী। তিনি এই খিলাফত আন্দোলনকে সমর্থন করলেন এবং কংগ্রেসকে কান ধরে বাধ্য করলেন খিলাফতিদের খিদমত করতে। তাঁর যুক্তি ছিল, মুসলমানদের এই দুঃসময়ে তাদের পাশে থাকা দরকার। এতে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য সাধন ও তা দ্বারা ছ'মাসের মধ্যে স্বরাজ এনে দেবেন। নিরন্তর ব্যর্থ প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও গান্ধীজীর এই ভ্রান্ত নীতিতেই আজও ভারতের রাজনীতি আবর্তিত হয়ে চলছে। খিলাফতিরা চরম বিভীষিকা ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করে মালাবারে (অধুনা কেরালা)। সেখানে জনৈক আলি মুদালিয়রের নেতৃত্বে খিলাফতরাজ প্রতিষ্ঠিত করে।

'মোপলা বিদ্রোহ' নাম দিয়ে ইতিহাসের এই নৃশংস অধ্যায়কে আড়াল করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বাবাসাহেব আম্বেদকর জানাচ্ছেন, 'জীবন ও সম্পত্তির যে কত ক্ষতি হয়েছে তার হিসাব কোনোদিন পাওয়া যাবে না, তবে নিঃসন্দেহে সেটা বিশাল'। পুলকিত বাপুজী মোপলাদের প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন, 'মোপলারা সাহসী, মোপলারা ধর্মভীরু, যা করছে তাদের ধর্মবিশ্বাস অনুসারেই করেছে'।

শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার সামরিক অভিযানের দ্বারা সেই খিলাফত রাজের অবসান ঘটায় এবং এক সময় খিলাফত আন্দোলন শেষ হয়। খিলাফতিরা অতঃপর ঘোষণা করে যে হিন্দুস্থান দার-উল-হার্ব হয়ে গেছে। একে পুনরায় দার-উল-ইসলামে পরিণত করতে হবে। করার সংকল্প নিয়ে প্রায় দশ হাজার খিলাফতি হিজরত (জিহাদের উদ্দেশ্যে দেশত্যাগ) করে। প্রথমে তারা যায় আফগানিস্তানে। আফগান সামরিক শক্তির সহায়তায় ভারত আক্রমণ করে ইসলামি শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। কিন্তু আফগান শাসক আমানুল্লাহ সাহসী না হওয়ায় বৃহত্তর ইসলামি কনফেডারেশন গড়ার লক্ষ্যে এদের এক প্রতিনিধি দল চলে যায় তুরস্কে। সেখানকার নতুন নেতা কামাল পাশা জানান যে হিন্দুস্থান বা খিলাফত নিয়ে তাঁদের কোনো মাথাব্যথা নেই আর তুরস্কের ব্যাপারে তুর্কিরা নিজেরাই ঠিক করে নেবে। ব্যর্থ হলেও খিলাফতিরা হতোদ্যম হননি।

নিরন্তর ভারতীয় সংস্কৃতিকে আক্রমণ, প্রকাশ্যে গোমাংস ভক্ষণ, ভারতকে টুকরো করার কসম খাওয়া, হিন্দুদের হিংসক বলা ইত্যাদি এ সকল বাম কারনামা মানুষের বুঝতে বাকি নেই।

কিছুকাল আগে রুশ বিপ্লবের সাফল্যের কথা ভেবে সেখান থেকে তখন তাঁরা চলে যান রাশিয়ায়। উদ্দেশ্য ছিল জিহাদের জন্য গেরিলা যুদ্ধের কিছু টিপস নেওয়া। রাশিয়ানরা ছাত্র পেয়ে তাদের মার্কসবাদ পড়াল। এই ভাবে খিলাফত আন্দোলনের ঔরসে, রুশ বিপ্লবের গর্ভে, মামার বাড়ি তাসখন্দে জন্মেছিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি।

মহম্মদ আলি, মহম্মদ শফিক সিদিকি,খুশি মহম্মদ প্রমুখ সকলেই ছিলেন হিজরতকারী খিলাফতি। কৌশলগত কারণে যে এমএন রায়কে সামনে রাখা হয়েছিল তিনিও ছিলেন প্রচণ্ডভাবে ইসলাম ভক্ত। তাঁর লেখা 'বিশ্ব সভ্যতায় ইসলামের অবদান' বইটি পড়লে তা স্পষ্ট হয়ে যাবে। তবে ডাকসাইটে কমিউনিস্ট ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত বা কবীর সুমনের মতো তিনি কলেমা পরে মুসলমান হয়েছিলেন কিনা তা জানা যায়নি।

নিরন্তর ভারতীয় সংস্কৃতিকে আক্রমণ, প্রকাশ্যে গোমাংস ভক্ষণ, ভারতকে টুকরো করার কসম খাওয়া, হিন্দুদের হিংসক বলা ইত্যাদি সকল বাম কারনামার রসায়ন আশা করি এতক্ষণে উপলব্ধি করা গেছে।

ধর্মকে আফিম বললেও ভারতের কমিউনিস্টরা ইসলামের মধ্যে অমৃত আস্বাদন করছেন আর প্রবল ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়াচ্ছেন শুধু হিন্দুদের প্রতি। মাওবাদী, নকশালবাদী-সহ সমস্ত বাম দলই ছদ্মবেশী জিহাদি। তারা প্যান ইসলামের নিয়ন্ত্রণে ভারতে ইসলামি শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করছে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : আক্কেল আলি।
(১৯৭৫-এ কমিউনিস্ট পার্টি থেকে বহিষ্কৃত)।

লাভ জিহাদ থেকে সতর্ক হতে হবে হিন্দু নারীদের

বটু কৃষ্ণ হালদার

ভালোবাসা হলো পৃথিবীর সবথেকে মধুর ও পবিত্রতম সম্পর্ক। যে সম্পর্কের কোনো তুলনা হয় না। তবে অনেকেই বলেন ভালোবাসার কোনো নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই। এটা অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ। ভালোবাসা হতে পারে প্রেমিকার, প্রকৃতির, স্রষ্টার, মা-বাবা-ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীদের সঙ্গে। তবে ভালোবাসা দিবসটি যেহেতু প্রেমিক-প্রেমিকাকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়েছে। ভালোবাসা হৃদয়ের একটি অনুভূতি। ভালোবাসা মানে দূরে থেকেও কাছে থাকার অনুভব করা। সবরকম ভালোবাসায় থাকতে হয় বিশ্বাস ও সম্মান। তবে ভালোবাসা একদিনের জন্য নয়, বছরের প্রতিটি দিনের জন্য ভালোবাসা থাকা দরকার।

ভালোবাসা মানে অঙ্গীকার। একজনের কাছে আরেকজনের দায়বদ্ধতা। কখনও প্রিয় মানুষটির প্রতি অশুভ আচরণ না করা। ক্ষতি না চাওয়া। সুখে-দুঃখে সব সময় পাশে থাকা। সুখ-দুঃখ ভাগ করে নেওয়ার নামই ভালোবাসা। এ ভালোবাসা ঋতুর মতো পরিবর্তনশীল নয়। সব সময় একই থাকবে। সুখে-দুঃখে সব সময় ভালোবাসা, মায়া দেখানো, কখনও-বা আদর দেখানো আবার শাসনও করা।

ভালোবাসা মনের একটি অনুভূতি। এ অনুভূতিটাও কেউ দেখতে পায় না, অনুভব করে বুঝে নিতে হয়। এ ভালোবাসা শুধু মানুষে মানুষে নয়। সব জীব ও জড়ের প্রতিও হতে পারে। ভালোবাসা হবে নিখুঁত। যেখানে থাকবে সম্মানবোধ। কোনো প্রতারণা থাকবে না। ভালোবাসা একদিনের জন্য নয়। একদিনে দেখানোর মতো ভালোবাসা বলতে কিছু নেই। প্রতিনিয়ত ভালোবাসতে হয়। ভালোবাসা দিয়ে ভালোবাসা জয় করতে হয়। আবার এই পবিত্র বিশ্বাস ও মায়ার বন্ধনে ভালোবেসে অনেকেই প্রিয় মানুষটিকে না পাওয়ার যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে এ পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে পাড়ি দিয়েছেন অন্য জগতে। একমাত্র ভালোবাসা দিয়ে সমগ্র বিশ্বকে জয় করা যায়—এমন জ্বলন্ত উদাহরণ আমাদের সমাজে বহু আছে। কিন্তু কাউকে ভালবেসে ধর্মান্তরিত করার বাসনায় ভালোবাসার মানুষটিকে খুন করে ৩৫ টুকরো করে ফ্রিজে রেখে দেওয়ার নাম কি ভালোবাসা?

মানুষ স্বাধীন সত্তা নিয়ে এই

পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। তাই এই পরিবেশের প্রতি কিছু সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকে। একটি পরিবেশকে সুস্থ ও বসবাসের যোগ্য করে তোলা সেই দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। শান্তিপূর্ণ পরিবেশ গড়ে তুলতে গেলে দরকার একে অপরের প্রতি আন্তরিকতা, হৃদ্যতা, ভালোবাসা। আপদে বিপদে একে অপরের পাশে থাকা। স্বাধীনতার পরে ধর্মনিরপেক্ষ দেশ হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে ভারতবর্ষ। জাতপাত, ধর্ম নির্বিশেষে পাশাপাশি বসবাস করেন এই দেশের মানুষ। সেই আন্তরিকতার বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু বর্তমানে এই সংস্কৃতিকে পদদলিত করে একে অপরের প্রতি হিংসায় মেতে উঠছে কিছু মানুষ। এর মাঝে যে বিষয়টি প্রকট হয়ে উঠেছে তা হলো লাভ জিহাদ। ভালোবাসার নামে কেড়ে নিচ্ছে প্রাণ। যে ভালোবাসা একটা সুন্দর সম্পর্ক গড়ে তোলে,সেই ভালোবাসা প্রাণ কেড়ে নিচ্ছে, ভাবতে কেমন অবাক লাগে। এই মুহূর্তে লাভ জিহাদের নিকৃষ্ট উদাহরণ হলো নিকিতা, শ্রদ্ধা ওয়াকার-সহ বহু ঘটনা। তবে এমন জঘন্য ঘটনা সমাজের বুকে প্রতি নিয়ত ঘটে চলেছে। বেশ কিছু কট্টর ধর্মীয় গোষ্ঠী ধর্মের নামে ভালবাসার মতো পবিত্র সম্পর্ককে কলঙ্কিত করে তুলেছে। এতে ভিন্ন ভাষা, ধর্মীয় অনুভূতিতে কঠোর ভাবে আঘাত হানছে। একে অপরের প্রতি বিশ্বাস হারাচ্ছে। ভালোবাসার নামে ধর্মকে টেনে নামাচ্ছে নোংরা অভিসন্ধির খেলায়।

শুধু ভারতবর্ষ নয়, বাংলাদেশ, পাকিস্তান-সহ বহু দেশে এই লাভ জিহাদের ফলে প্রাণ হারাচ্ছেন নিষ্পাপ মেয়েরা। জোর করে বিধর্মী নারীদের ধর্ষণ, ধর্মান্তরিত করার ঘটনা তো আছেই। প্রতিনিয়ত বিশ্বাসের অপমৃত্যু ঘটছে। কিন্তু একটা কথা মনে রাখা দরকার, প্রকৃত ভালোবাসার কখনো মৃত্যু হয় না। তাই তো রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন, 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ'। সমাজ থেকে বিশ্বাস আর ভালোবাসার মৃত্যু ঘটলে সমাজ অন্ধকারে ঢেকে যাবে। চলবে রক্তের হোলি খেলা। চোখের জল একমাত্র সম্বল হয়ে দাঁড়াবে। এই নিয়মের বাইরে বেরিয়ে এসে কিছু বিবেকহীন মানুষ ধর্মকে কলুষিত করে তুলেছে। ধর্মের নামে জেহাদি আতঙ্ক ছড়াচ্ছে। এই জেহাদিরা রক্তের গন্ধ খুঁজে বেড়ায়। জেহাদি আতঙ্ক আজ বিশ্বের মাথাব্যথার অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকার এইসব সমস্যার পিছনে সময় নষ্ট করে চলেছে, তাতে দেশের সার্বিক উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। আমাদের নিজেদের সতর্ক থাকতে হবে। যারা ধর্মের নামে সমাজকে কলুষিত করার চেষ্টা চালাচ্ছে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। যারা এমন জঘন্য ঘটনা ঘটাচ্ছে তাদের মনে রাখা উচিত এতে সেই ধর্মের প্রতি মানুষের কাছে ভুল বার্তা যাচ্ছে। মানুষ একে অপরের প্রতি ধর্মীয় বিশ্বাস হারাচ্ছে। কৃষক যেমন শস্য বাঁচাতে আগাছা নির্মূল করে, ঠিক তেমনি ধর্মের আগাছাগুলোকে ধ্বংস করে ধর্মকে শুদ্ধ ও জনমুখী করে তোলা দরকার। ধর্মকে সর্বজনগ্রাহ্য করে তোলা উচিত। ধর্ম সর্বদা পবিত্র। তাকে কলুষিত করতে এক শ্রেণীর শিক্ষিত মানুষকে এই কাজে ব্যবহার করে, তাদের সুন্দর ভবিষ্যৎকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

লাভ জিহাদের ৪০০টির বেশি ঘটনার কথা উল্লেখ করে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সুরেন্দ্র জৈন বলেন— জিহাদের বিভিন্ন রূপের মধ্যে লাভজিহাদ আজ সবচাইতে জঘন্য নিষ্ঠুর ও অমানবিক পন্থা। লাভ জিহাদ এবং বেআইনি ধর্মান্তরণ প্রতিরোধের জন্য একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় আইন দরকার। না হলে সামাজিক অসন্তোষ এবং জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে মারাত্মক বিপদ দেখা দেবে। ২০১০ সালে কেরালা হাইকোর্ট লাভ জেহাদকে ধর্ম পরিবর্তনের সব থেকে ভয়ংকর রূপ বলে অভিহিত করেছিল। এটা কিছু বিকৃত মানসিকতার জিহাদি যুবকদের নিষ্ঠুরতা বলে এড়ানো যাবে না, কারণ এর পিছনে রয়েছে মোল্লা, মৌলবি, কট্টরবাদী নেতাদের অনুপ্রেরণা এবং টুকড়ে টুকড়ে গ্যাঙের সহযোগিতা। হিমাচল প্রদেশ এবং লাদাখের মতো শান্তিপ্রিয় রাজ্যগুলি লাভ জিহাদে বিপর্যস্ত। ক্ষোভের মাত্রা বেড়ে চলেছে। শুধু তাই নয়, কেরলে চার্চগুলি জানিয়েছে, খ্রিস্টান মেয়েদেরও ফাঁদে ফেলে সিরিয়া ও আফগানিস্তানে পাঠানো হচ্ছে। তবে এক্ষেত্রে পপুলার ফ্রন্ট অব ইন্ডিয়ার মতো বহু সন্ত্রাসবাদী সংগঠন কোটি কোটি টাকার সাহায্য দিয়ে এই সমস্ত বিকৃতমস্তিষ্ক জিহাদিদের পাশে দাঁড়ায়। বহু দেশ এই সমস্ত জঘন্য ও নোংরা কাজের জন্য অর্থ সাহায্য করে।

ধর্মকে নিয়ে যারা ব্যবসা শুরু করছে সেই সমস্ত ভণ্ড ধর্মব্যবসায়ীদের চিহ্নিত করে কঠোরতম শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে, সে যে ধর্মেরই হোক না কেন। আর এই দায়িত্ব কিন্তু সরকারকে নিতে হবে। সরকার এই লাভ জিহাদের বিরুদ্ধে যত দ্রুত পদক্ষেপ নেবে তা সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক। আর তাতেই ফিরবে ধর্ম, ধর্মের মেলবন্ধন।

এই মুহূর্তে আমাদের প্রার্থনা, যুদ্ধ নয়, শান্তি। নৈরাজ্য, অস্থিরতা, মৃত্যু, রক্তপাত, হাহাকার, চোখের জল নয়। শুধু ভালোবাসা দিয়ে গড়া একটি শান্তিপূর্ণ সমাজব্যবস্থা চাই। ▫

মৃত্যুর সংকেত থেকে জীবনের পথনির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ মৃত্যুর মতো নির্মম সত্যি আর দুটো নেই! তার ছায়া কোনও পরিবারের ওপর দৈবাৎ এসে পড়ে তা হলে কোনও প্রিয়জনকে হারিয়ে ফেলার অনুভূতি পাথরের মতো চেপে বসে। কিন্তু যখন এর উলটো ঘটে? অর্থাৎ মৃত্যু যখন মানুষকে আরও বেশি করে জীবনের দিকে ঠেলে দেয়?

এ কাহিনির শুরু ২০১৩ সালে। তখন নয়ডার রাহুল রস্তোগী বিখ্যাত সামসঙের রিসার্চ অ্যান্ড ডেভলেপমেন্ট ল্যাবরেটরিতে আড়াইশোজন ইঞ্জিনিয়ারকে নিয়ে গড়া টিমের মাথা। রাহুলের স্ত্রী নেহাও একটি বিখ্যাত সফ্টওয়ার কোম্পানিতে কর্মরত। বোঝাই যাচ্ছে কোথাও কোনও সমস্যা নেই। ঠিক এই সময়েই এমন একটা ঘটনা ঘটল যা শুধু পরিবেশ-পরিস্থিতিকেই নয়, চারপাশের মানুষগুলোকেও আমূল বদলে দিল।

ওই বছর অর্থাৎ ২০১৩ সালে রাহুলের বাবা অরুণকুমার রস্তোগী হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হন। সে যাত্রা কোনওক্রমে বেঁচে গেলেও এই ঘটনা রাহুল ও নেহাকে এক ধর্মসংকটের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। রাহুলের নিজের কথায়, 'এই ঘটনার পর আমরা দু'জনেই খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি। কারণ আমাদের অনুপস্থিতিতে এই ধরনের ঘটনা যদি আবার ঘটে তাহলে বাবার ঠিক কী হয়েছে তা তো ধরা পড়বেই না, উপরন্তু রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যেতেও অনেক দেরি হয়ে যাবে।'

এরপর ওরা বাজারে এমন একটি ডিভাইসের সন্ধান করতে লাগলেন যা কারও হার্টের সমস্যার হালহদিশ চট করে ধরে ফেলতে সক্ষম। শুধু তাই নয়, ডিভাইসটিকে এমন হতে হবে যাতে অরুণ রস্তোগীর মতো বিন্দুমাত্র কম্পিউটার জ্ঞান না থাকা মানুষও সহজে ব্যবহার করতে পারে। এবং হার্ট কেমন আছে জেনে নিয়ে দরকারে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে নিজেই যোগাযোগ করতে পারে।

নেহা বলেন, 'কিন্তু আমরা যখন কোথাও এই ধরনের ডিভাইস খুঁজে পেলাম না তখন ঠিক করলাম আমরা নিজেরাই এরকম একটা ডিভাইসের ডিজাইন করব। আমরা দুজনেই যেহেতু ইলেকট্রনিক ও টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ার এবং হার্ডওয়ার ও সফ্টওয়ার ডিভাইস ডিজাইন করার পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা যেহেতু আমাদের আছে— তাই কোনও অসুবিধে হবে না। বাড়িতেই ল্যাব তৈরি করে আমরা কাজ শুরু করলাম। এখান থেকেই জন্ম হলো সংকেত লাইফের।' দুর্ভাগ্যবশত রাহুলের বাবা ২০২১ সালে ক্যানসারে মারা যান। কিন্তু যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন নিজের হার্টের দেখভাল তিনি সংকেত লাইফের মাধ্যমেই করতেন।

রাহুল বলেন, 'সংকেত লাইফ ১২ লেডের ইসিজি মনিটরিং ডিভাইস। এই ডিভাইস দিয়ে ইসিজি করা যায় এবং সংকেত লাইফ অ্যাপের মাধ্যমে ইসিজির রিপোর্ট অ্যান্ড্রয়েড স্মার্টফোনে দেখা যায়। সব থেকে বড়ো কথা হলো, এই রিপোর্ট কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ডাক্তারবাবু বা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো সম্ভব। এর ফলে সময় বাঁচে, অযথা প্রাণহানির আশঙ্কাও কমে।'

হৃদরোগে আক্রান্ত হবার পর দ্রুত রোগনির্ণয় এবং সঠিক সময়ে রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করা সম্ভব হয় না বলে ভারতবর্ষে বহু মানুষ মারা যান। এই পরিপ্রেক্ষিতে রাহুল ও নেহার আবিষ্কার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অন্তত হাতের কাছে সংকেত লাইফ থাকলে রোগী নিজেই অথবা তার বাড়ির লোক হার্টের অবস্থা বুঝে যত দ্রুত সম্ভব ডাক্তারবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন। হৃদরোগ নিয়ে প্যানিক অনেকটাই কেটে যাবে। □

ইতিহাসের গল্প

নবাঙ্কুর

বিবেকবান শিবাজী

রাত্রিবেলা শিবাজী মহারাজা তাঁর বিছানায় ঘুমিয়েছিলেন। কীভাবে একটি তেরো-চোদ্দ বছরের একটি বালক তাঁর শোবার ঘরে ঢুকে পড়ে। এদিক ওদিক তাকিয়ে শিবাজীকে মারার জন্য সে তলোয়ার বের করে শিবাজীর গলায় কোপ বসাতে যাবে এমন সময় পেছন থেকে ছত্রপতির বিশ্বস্ত সেনাপতি তানাজী তলোয়ার সমেত তার হাত ধরে ফেলেন। তানাজী বালককে আগেই দেখে ফেলেছিলেন, তাই তার একেবারে পেছনেই ছিলেন।

শিবাজীর ঘুম ভেঙে গেল। তিনি বালককে জিজ্ঞাসা করতেন, কে তুমি? এখানে কীভাবে এলে?

—আমার নাম মালোজী। আমি লুকিয়ে আপনাকে হত্যা করতে এসেছিলাম।

—কেন তুমি আমাকে হত্যা করতে চাও? আমি তোমার কী ক্ষতি করেছি?

—আপনি আমার কোনো ক্ষতি করেননি। আমরা খুব গরিব। আমি ও আমার মা ক'দিন থেকে কিছু খাইনি।

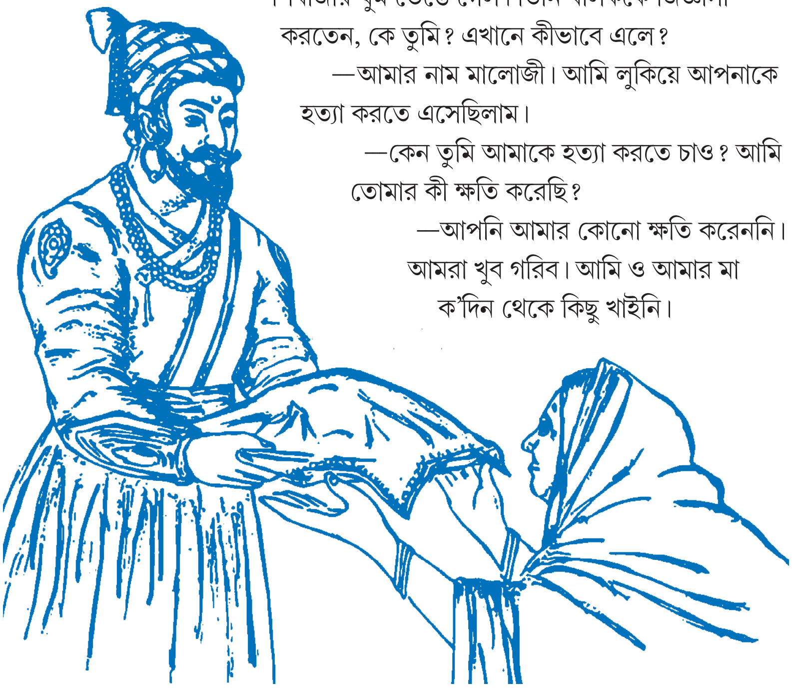

আপনার শত্রু সুভাগরায় আমাকে বলেছিল আপনাকে হত্যা করতে পারলে অনেক ধনসম্পদ দেবে।

এটা শুনেই তানাজী গর্জে উঠে বললেন, দুষ্ট বালক! ধনসম্পদের লোভে তুমি হিন্দুদের রক্ষাকর্তাকে হত্যা করতে এসেছ? এখনি তোমাকে কেটে ফেলব।

বালক একটুকুও ভয় না পেয়ে শিবাজী মহারাজার দিকে তাকিয়ে বলল, মহারাজ, আমি মৃত্যুকে ভয় পাই না। তারজন্য আমার কোনো চিন্তা নাই। কিন্তু বাড়িতে আমার মা খুব অসুস্থ আর ক্ষুধার্ত। আজ না খেতে পেলে মা মারা যাবে। আপনি একবার মাকে দেখে আসার অনুমতি দিন। মাকে প্রণাম করে আগামীকাল সকালেই আপনার কাছে ফিরে আসবো। তখন আপনি আমাকে হত্যা করবেন।

তানাজী বললেন, না না, তুমি ধোকা দেবার চেষ্টা করছ। তুমি পালিয়ে গিয়ে আর আসবে না। তোমাকে এখনি হত্যা করব।

বালক বলল, না আমি পালিয়ে যাব না। আর আমি মিথ্যাও বলছি না। আমি মরাঠা। মরাঠারা কখনোও মিথ্যা বলে না।

শিবাজী মহারাজা ইশারায় তানাজীকে থামতে বলে বালককে কিছু খাবার হাতে দিয়ে ঘরে যাবার অনুমতি দিলেন। বালক নির্ভয়ে চলে গেল। শিবাজী লক্ষ্য করলেন বালকের চোখে জল।

পরদিন সকালে শিবাজী মহারাজা রাজদরবারে সিংহাসনে বসে দরবার পরিচালনা করছেন। এমন সময় দ্বারপাল এসে খবর দিল, এক বালক মহারাজার সাক্ষাৎপ্রার্থী।

বালককে দরবারে নিয়ে আসা হলো। দেখা গেল ওই বালক আগের দিনের শিবাজী মহারাজকে হত্যা করতে আসা মালোজী। মালোজী শিবাজী মহারাজাকে অভিবাদন করে বলল, মহারাজ, আমি আপনার উদারতার জন্য কৃতজ্ঞ। মাকে প্রণাম করে এসেছি। এবার আপনি আমাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারেন।

শিবাজী মহারাজ সিংহাসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন। এগিয়ে এসে বালককে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, তোমার মতো বীর ও সত্যবাদী বালককে যদি প্রাণদণ্ড দিই, তবে দেশে থাকবে কে? তোমার মতো বালক তো মহারাষ্ট্রের কাছে একটি রত্ন।

শিবাজী মহারাজ সেনাপতি তানাজীকে আদেশ দিলেন এই বালককে সেনাবাহিনীতে নিযুক্ত করে নিতে। তারপর রাজবৈদ্যকে নিয়ে নিজেই চলে গেলেন মালোজীর মায়ের সঙ্গে দেখা করতে। মায়ের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে এবং কয়েকমাসের খাদ্যসামগ্রী দিয়ে রায়গড়ে ফিরে এলেন। শিবাজীর বিচক্ষণতায় মানুষ ধন্য ধন্য করতে লাগল।

এই মালোজীই পরবর্তীকালে শিবাজীর একজন দক্ষ সেনাপতি হয়ে উঠেছিলেন।

সংগৃহীত

বীর বনবাসী

রাঘোজী ভাংগরে

কোলী জনজাতি সমাজের রাঘোজী ভাংগরের জন্ম ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দের ৮ নভেম্বর মহারাষ্ট্রের আকোলার দেবগাঁওয়ে। তাঁর বাবা মারাঠা সাম্রাজ্যের একজন সুবেদার ছিলেন। তিনিও আহমদনগরে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। ব্রিটিশরা তাঁকে আন্দামান জেলে বন্দি রাখে। যুবক রাঘোজীও ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নিয়েছিলেন। ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে যুদ্ধে রাঘোজী ধরা পড়েন এবং ২ মে আহম্মদনগর সেন্ট্রাল জেলে তাঁর ফাঁসি হয়। মহারাষ্ট্র সরকার প্রতিবছর তাঁর বলিদান দিবস উদ্‌যাপন করে। ২০১৪ সালে রাঘোজীর নাম ও সম্মানে ঠানেতে সার্কিট হাউস নির্মাণ করা হয়। তাঁর গ্রামেও তাঁর নামে স্মারকবেদী নির্মাণ করা হয়েছে।

জানো কি?

- বিশ্বে মোট জনসংখ্যার প্রায় ১৩ শতাংশ বাঁ-হাতি।
- চিকিৎসাবিজ্ঞানের মতে বাঁ-হাতিরা একটু বেশি সৃজনশীল, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও চিন্তাশীল হয়ে থাকে।
- উন্নত দেশে মেধাবী মানুষদের চলে যাওয়াকে ব্রেনড্রেন বলা হয়।
- মিলেট উৎপাদনে পৃথিবীতে ভারত প্রথম স্থান অধিকার করেছে।
- ডাল উৎপাদনে ভারতে প্রথম স্থান অধিকার করেছে মধ্যপ্রদেশ।
- মানুষ ঘুম ছাড়া ১১ দিনের বেশি বাঁচতে পারে না।

ভালো কথা

কালুয়ার বন্ধু

কালুয়ার কত বয়স কেউ জানে না। বাবা বলেন, কালুয়া পঁচিশ বছর থেকে আমাদের পাড়ার মন্দিরটাতে থাকে। ওর নামও কেউ জানে না, দেখতে কালো তাই সবাই কালুয়া বলে। চুল বড়ো বড়ো। গোঁফ দাড়িতে মুখ ঢাকা। খালি চোখদুটো দেখা যায়। কাউকে ও বিরক্তও করে না। সারাদিন দোকানে দোকানে বিস্কুট ও পাউরুটি চেয়ে নিয়ে ওর ব্যাগটাতে রাখে। কেউ বিরক্তও হয় না। একটা-দুটো করে সবাই দেয়। সন্ধ্যোর মুখে ও মন্দিরে গিয়ে বসে। তখন পাড়ার ২০/২৫টা কুকুর ওর চারপাশে এসে বসে ওর সঙ্গে খেলা করতে শুরু করে। ও তখন ব্যাগ থেকে বিস্কুট পাউরুটি বের করে কুকুরগুলিকে খাওয়াতে শুরু করে। ও নিজেও দু'একটা খায়। খাওয়া হয়ে গেলে কুকুরগুলির মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। সবাই বলে ওরা কালুয়ার বন্ধু।

প্রিয়ব্রত সরদার, দ্বাদশ শ্রেণী, ক্যানিং, দঃ ২৪ পরগনা।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) গ্নি রী প ক্ষা

(২) শ্য না ক ব

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) র রি জ র্জ না ত হা অ

(২) ই বু ভা আ ড়ো ত

১৫ মে সংখ্যার উত্তর

(১) বরকর্তা (২) মেয়েপক্ষ

১৫ মে সংখ্যার উত্তর

(১) পরমাসুন্দরী (২) বর্ষণমুখর

উত্তরদাতার নাম

(১) মৌমিতা দেবনাথ, নিমতা, কলকাতা-৪৯। (২) শিবাংশী পাণিগ্রাহী, মকদুমপুর, ইবি, মালদা। (৩) সুরঞ্জনা মণ্ডল, রবীন্দ্রনগর, বারুইপুর। (৪) শ্রেয়সী রায়, ডায়মণ্ড হারবার, দ: ২৪ পরগনা।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

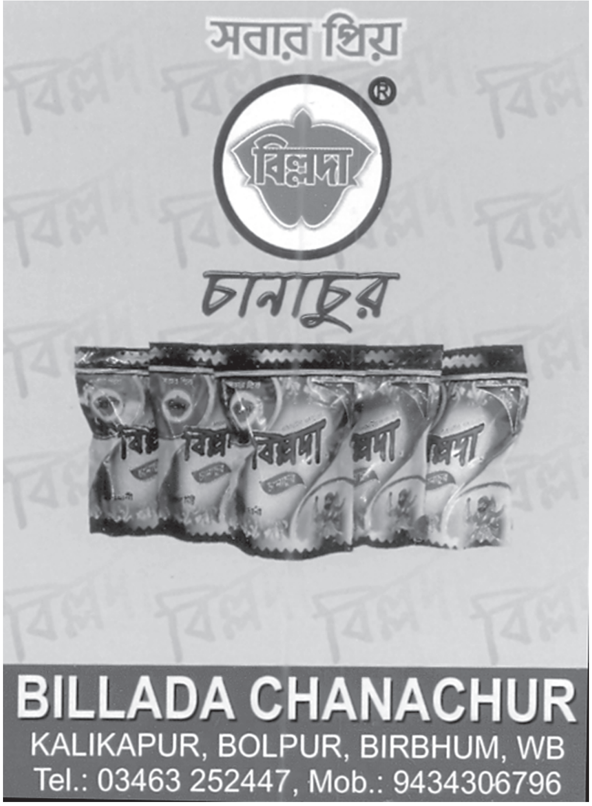

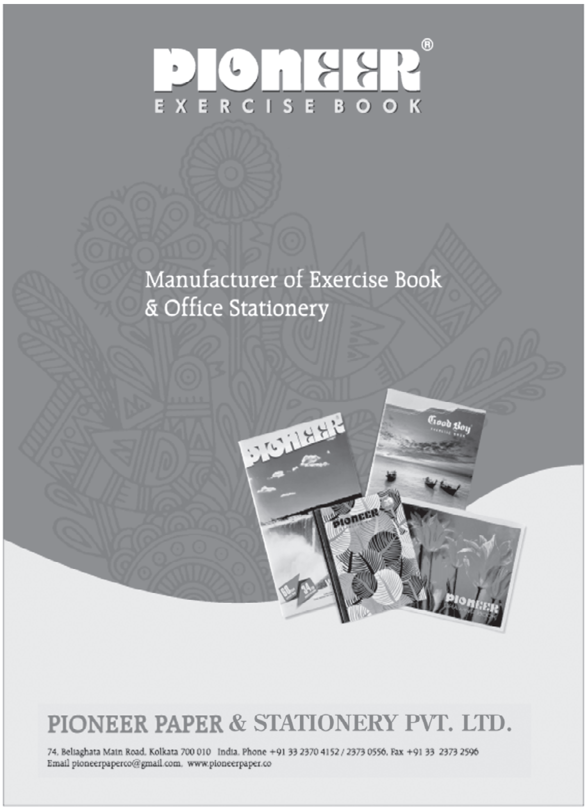

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের
ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

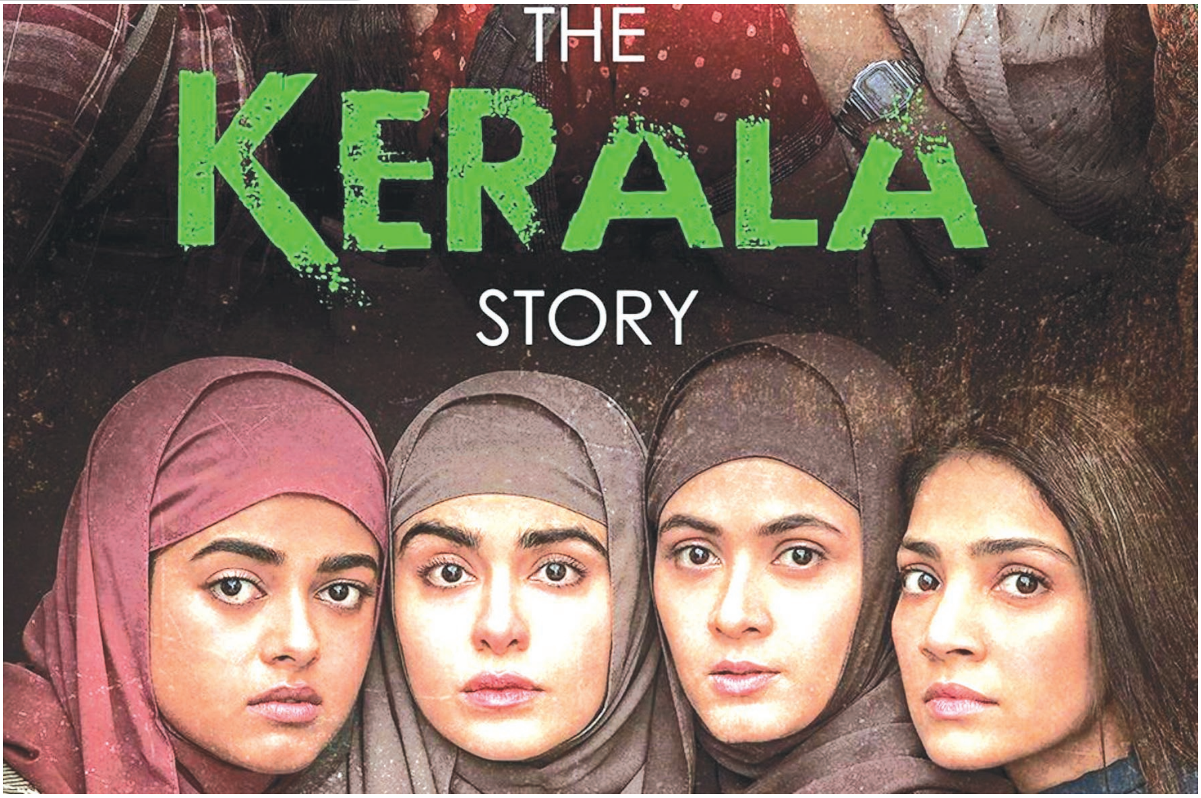

'দ্য কেরালা স্টোরি'

ধর্মান্তরণের বীভৎস পরিণতির চিত্র

রঞ্জন কুমার দে

দ্য কাশ্মীর ফাইলসের ঈর্ষণীয় সাফল্যের পর দ্য কেরালা স্টোরি বলিউড ডিঙিয়ে রাজনৈতিক তরজার মারপ্যাঁচে। সিনেমাটির নির্মাতা সুদীপ্ত সেন কেরালা রাজ্যের হিন্দু খ্রিস্টান যুবতী, মহিলাদের ধর্মান্তরণের নির্মম পরিহাস এবং সন্ত্রাসবাদী সংগঠন ইসলামিক স্টেট ইরাক-সিরিয়ার সঙ্গে কেরালার ধর্মান্তরণের যোগসূত্রের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। যুবতীদের নেশাজাতীয় দ্রব্যের অভ্যাস, ব্রেনওয়াশ, ধর্মান্তরকরণ, টানাধর্ষণ, মানব পাচার, বলপূর্বক গর্ভপাতের প্রতিচ্ছবি দ্য কেরালা স্টোরি। তাঁদের প্রসব হওয়া সন্তানদের কেড়ে নিয়ে আত্মঘাতী মানববোমা রূপে তৈরি করা হয়েছে। কেরালার প্রায় ৩২ হাজার যুবতী নিখোঁজের পর জোরপূর্বক ইসলামে ধর্মান্তরণ এবং অতঃপর আইএসআইএস-এ নিয়োগ করা হয়। ফতেমা নামে একজন মালয়লি নার্সের চরিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সেখানে যার চরিত্রে অভিনয় করেছেন আদহা শর্মা। সিনেমাটি রিলিজ হওয়ার পর নিত্যদিন একেকটা সাফল্য স্পর্শ করেছে, নেটিজেনরা এই প্রদর্শনীটিকে সাহসী, নিরপেক্ষ এবং অপ্রতিরোধ্য আখ্যায়িত করেছেন, অনেকে আবার সমালোচনাও করেছেন। চিত্রনির্মাতাদের দাবি প্রয়োজনটি একটি দীর্ঘ গবেষণামূলক এবং লুক্কায়িত নির্মম কালো অধ্যায়ের উন্মোচন।

দ্য কাশ্মীর ফাইলসের মতো স্বভাবতই বামপন্থী সংগঠনগুলি হাত ধুয়ে দ্য কেরলা স্টোরিকে নিষিদ্ধ করতে মাঠে নেমে পড়েছে। কেরালা ইউনিটের রাজ্যসভা সংসদ জন ব্রিটাস ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে সিনেমাটির টিজার বন্ধের আবেদন জানিয়ে আসছিলেন। জেএনইউ-এর এসএফআই ইউনিটও আপত্তি জানিয়ে আসছিল কিন্তু ক্যাম্পাসে ছবিটির প্রিমিয়াম খুব ধুমধাম উৎসাহ উদ্দীপনায় পরিবেশন হয়। কেরলের শাসক সিপিএম এবং প্রধান বিরোধী কংগ্রেস ইস্যুটিকে হাত মিলিয়ে সিনেমাটিকে মিথ্যা, আরএসএসের অ্যাজেন্ডা হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। সিনেমাটির ট্রেলার রিলিজের পর থেকেই কংগ্রেস ও বামপন্থীরা অভিযোগ করে আসছিলেন সিনেমায় কেরালাকে সন্ত্রাসীদের মুক্তরাজ্য হিসেবে দেখানো হয়েছে যা বাস্তবে সম্পূর্ণ মিথ্যা। ঘৃণা ছড়ানো ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তকমায় তারা ছবিটির মুক্তি আটকাতে সুপ্রিম কোর্টের দরজায় কলকাঠি নাড়ায়। মহামান্য কোর্ট তাঁদের রায়ে জানান যে দ্য কেরালা স্টোরির নিষিদ্ধ করার কোনো প্রয়োজন নেই।

আজকের দিনের সিনেমা 'দ্য কেরালা স্টোরি' কেবল লাভ জেহাদ ও ইসলামিক আতঙ্কবাদের নগ্ন চিত্র উন্মোচন করলেও অনেক আগে থেকেই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কেরালার সঙ্গে ইসলামিক স্টেটের যোগসূত্র প্রকাশিত হয়ে আসছে। কেরালা আইএসআইএস এবং কট্টর ইসলামিক নিষিদ্ধ সংগঠন পিএফআই'র ছিল খোলা বিচরণ ভূমি। মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট শিরোনামের রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২০ সালের নভেম্বর পর্যন্ত ৬৬ জন ভারতীয় বংশোদ্ভূত জেহাদি আইএসআইএস-এর সঙ্গে যুক্ত ছিল। ২০১৯ সালে রাজ্যে স্বররাষ্ট্রমন্ত্রী জি কিষাণ রেড্ডি সংসদের এক প্রশ্নোত্তরে জবাব দিয়েছিলেন এনআইএ এবং রাজ্যে পুলিশবাহিনী আইএসআইএস-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পুরো দেশ জুড়ে এমন ১৫৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে যার অধিকাংশেরই কেরালা কানেকশন ছিল। আইএসআইএস দীর্ঘকাল থেকেই ভারতকে তাদের তথাকথিত 'খোরাসান খিলাফতের' অংশ হিসেবে দেখে এসেছে, যেমনটা ভারতকে জেহাদি সন্ত্রাসীরা গজবা হিন্দের অংশ হিসেবে কল্পনা করে।

সন্ত্রাসবাদী এই সংগঠন প্রথম ২০১৩ সালে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার নজরে আসে যখন সিরিয়ায় ভারতীয়রা আইএসআইএস-এ যুদ্ধের কাজে নিযুক্ত থাকার পোক্ত প্রমাণ আসে। ২০১৬ সালে টাইমস অব ইন্ডিয়ার এক রিপোর্ট অনুসারে কোঝিকোড় এবং মালাপ্পুরমের দুইটি স্বীকৃত ধর্মান্তর কেন্দ্র ২০১১ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে প্রায় ৬০০০ জনকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করেছে, যাদের মধ্যে ৪৯১৯ জন হিন্দু এবং বাকি ১০৭৪ জন খ্রিস্টান। উল্লেখ্য, ধর্মান্তরিতদের মধ্যে অধিকাংশই নারী যাদের বয়স ছিল গড়ে ৩৫ বছরের নীচে। তাই চিত্র নির্মাতা বারবার দাবি করে আসছেন সিনেমাটি কোনো কাল্পনিক কাহিনির নয় বরং প্রত্যেকটি চরিত্র, সংলাপ সত্য ঘটনা অবলম্বনে। সিনেমাটির কয়েকটি সংলাপ ও দৃশ্য খুবই হৃদয় বিদারক, নির্মম ও ভয়ানকও বটে।

সিনেমাটির একটি দৃশ্যে দেখা যাচ্ছে এক মৌলানা নির্দেশ দিচ্ছে অমুসলমান মেয়েদের নিজেদের সংস্পর্শে নিয়ে এসে ওদের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক বানাও, প্রয়োজন হলে ওদের গর্ভবতী বানিয়ে দাও। আরেকটি দৃশ্যে এমন যে তিন হিন্দু যুবতী তাদের এক মুসলমান

বান্ধবীর সঙ্গে বসে খাবার খাচ্ছে। সেখানে ওই মুসলমান বান্ধবীটি ওদের জিজ্ঞেস করে তোমরা কোন ভগবানের ইবাদত করো। তারা সরল মনে শিবের নাম জানায়। তখন মুসলমান মেয়েটা বলে উঠে যে নিজের স্ত্রীর মৃত্যুতে যে সাধারণ মানুষের মতো কাঁদে সে কীভাবে ভগবান হতে পারে! এরপরে দেখা যায় হিন্দু যুবতীদের সঙ্গে অভদ্র আচরণ করা হচ্ছে।

তখন ওই মুসলমান বান্ধবীটি তিন হিন্দু যুবতীদের এই বলে ব্রেইন ওয়াশ করেছে যে হিজাব পরিহিতা মেয়ের সঙ্গে কোনো ধর্ষণজনিত ঘটনা হয় না বা কেউ তাদের ইভটিজিংও করে না, স্বয়ং আল্লাহ তাদেরকে রক্ষা করেন। সিনেমাটির এক চরিত্রে সংলাপ এরকম ছিল যে, 'আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীও স্বীকার করেছেন যে আগামী ২০ বছরে কেরালা এক ইসলামিক স্টেটে রূপান্তরিত হবে।' যদিও পরবর্তীতে কোর্টের নির্দেশে অংশটি ছেঁটে ফেলা হয়। প্রধান চরিত্র হিন্দু সংস্কারি যুবতী শালিনী কৃষ্ণনের ব্রেইন ওয়াশ করে তাকে ফতেমা বানানো হয়ে থাকে। অতঃপর বিয়ে এবং শেষ পরিণতি আইএসআইএস ক্যাম্পে যৌনদাসীর জীবন। এই চলচ্চিত্রে দেখানো হয়েছে কীভাবে লাভ জেহাদের ভয়ংকর মডিউল কেরালায় কাজ করছে। সম্ভবত এই প্রথম প্রধানমন্ত্রী মোদী কোনো চলচ্চিত্রের প্রশংসা কোনো রাজনৈতিক র‍্যালিতে প্রকাশ্যভাবে করেছেন, সেই সঙ্গে কংগ্রেস-সহ বিরোধী জোটকে সিনেমাটির বিরোধিতা করার জন্য ঘোর নিন্দাও করেছেন।

স্বভাবতই দেশের অন্যতম মুসলমান সংগঠন জমিয়ত উলেমা এ-হিন্দ সুপ্রিম কোর্টে একটি পিটিশন আবেদন করে জানায় যে সিনেমাটি মুসলমান সম্প্রদায় বিশেষ করে মুসলমান যুবকদের জন্য অবমাননাকর। অবশ্য সর্বোচ্চ আদালত সেই আর্জি কোনো অবস্থাতেই মঞ্জুর না করে ফুৎকারে উড়িয়ে দেন। বাম কংগ্রেস কেরালা হাইকোর্টে সিনেমাটি বন্ধের আর্জি করলে কোর্ট সাফ জানিয়ে দেয় যে সিনেমাটি বিশেষ কোনো সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আপত্তিকর কিছু নেই, সিনেমাটিতে শুধু সন্ত্রাসবাদী সংগঠন আইএসআইএসের বিরুদ্ধে। আদালত আরও জানায় যে, 'বাক ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা বলে কিছু আছে। তাদের শৈল্পিক স্বাধীনতা আছে, আমাদের সেটারও ভারসাম্য রাখতে হবে'।

কেরালা হাইকোর্ট আরও উপলব্ধি করতে পারে যে আবেদনকারীর কেউই সিনেমাটি আদতে দেখেননি। অবশ্য কোর্ট সিনেমাটির কর্তৃপক্ষদের ৩২০০০ সংখ্যার মহিলার কেরালা থেকে আইএসআইএসে যোগদানের অংশটি তাদের সোশ্যাল মিডিয়ার অংশ থেকে সরিয়ে দেবার নির্দেশ জানায়। পরিচালক কোর্টের আদেশ যথাযথ পালন করে জানান যে, ২০১০ সালে তৎকালীন কেরালার কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রী ওমেন চান্ডি বিধানসভায় স্বীকার করেছিলেন প্রতি বছর আনুমানিক ২৮০০-৩২০০ মেয়ে ইসলামে ধর্মান্তরিত হচ্ছে। সেই হিসেবে আজকের দিন পর্যন্ত হিসেব করলে সংখ্যাটা সহজেই ৩২০০০ সংখ্যা পার করে দিচ্ছে।

সিনেমাটি বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশে ট্যাক্স ফ্রি হলেও তামিলনাড়ুর সিনেমা থিয়েটার ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সিনেমাটি তাদের হল থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। একমাত্র মমতা সরকার দ্য কোরালা স্টোরিতে প্রতিবন্ধকতা লাগিয়েছিলেন এই বাহানায় যে সিনেমাটির কিছু দৃশ্য রাজ্যের শান্তি শৃঙ্খলার জন্য বিপজ্জনক। অথচ তিনিই পদ্মাবত সিনেমা বিতর্কে বলেছিলেন এই বিতর্ক শুধু দুর্ভাগ্যজনকই নয়, নিজেদের মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে নষ্ট করার জন্য একটি সুপরিকল্পনাও বটে। দ্য কেরালা স্টোরি মাত্র এক সপ্তাহে ১০০ কোটির ক্লাবে পৌঁছে নিজেদের সাফল্যের দলিল আরেকবার পেশ করল এবং দর্শক নীরবে কেরালার ধর্মান্তরকরণের কালো অধ্যায়ের সাক্ষী হয়ে রইল। □

কর্ণাটকে টুকরে টুকরে গ্যাং জেগে উঠেছে

মণীন্দ্রনাথ সাহা

কর্ণাটক বিধানসভা ভোটের ফল প্রকাশ হয়েছে। সেখানকার বিধানসভায় মোট আসন ২২৪টি। সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে প্রয়োজন ১১৩টি আসন। এবারের নির্বাচনে এই রাজ্যে কংগ্রেস ১৩৬টি, বিজেপি ৬৬টি, জেডিএস ১৯টি এবং অন্যান্যরা ৩টি করে আসন পেয়েছে। শতাংশের বিচারে কংগ্রেস ৪২.৯ শতাংশ, বিজেপি ৩৬ শতাংশ এবং জেডিএস ১৩.৩ শতাংশ ভোট পেয়েছে। অথচ ২০১৮ সালের নির্বাচনে বিজেপি ১০৪টি, কংগ্রেস ৮০টি, জেডিএস ৩৮টি এবং অন্যান্যরা ২টি আসন পেয়েছিল।

ভোটের ফল প্রকাশের পর প্রধানমন্ত্রী বলেছেন— 'কর্ণাটকের বিধানসভায় জয়ী হওয়ার জন্য কংগ্রেসকে অভিনন্দন। জনগণের স্বপ্ন পূরণের জন্য তাদের উদ্দেশে আমার শুভকামনা রইল।'

কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেছেন— 'আমাদের দায়িত্ব বেড়ে গেল। অভিনন্দন কর্ণাটকবাসীকে। প্রতিশ্রুতি পালন করতে হবে আমাদের।'

বিজেপির বাসবরাজ বোম্মাই বলেছেন--- 'আমরা ম্যাজিক ফিগারে পৌঁছতে পারিনি। কংগ্রেস সেটা পেয়েছে। কেন এই হার হয়েছে, কোথায় ভুলত্রুটি হয়েছে আমরা বিশ্লেষণ করে দেখব। এই হার থেকে শিক্ষা নিয়ে চব্বিশের লোকসভায় বিজেপি কর্ণাটকে অসাধারণ ফল করবে।'

ভোটের ফল প্রকাশের পর বিভিন্ন জনের কথাবার্তা, আলোচনা ও উল্লাসের বহর দেখে মনে হচ্ছে বিজেপি ভারতের রাজনীতি থেকে হারিয়ে গেছে আর কংগ্রেসের রাহুল গান্ধী ভারতের প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসে গেছেন। ইতিমধ্যে ভোট বিশেষজ্ঞদের মধ্যে কেউ কেউ ভোটের ফল নিয়ে তাঁদের মতামত প্রকাশ করেছেন, আরও অনেকেই মত প্রকাশ করবেন। উপরন্তু বিজেপি দলের রথী- মহারথীরাও এই

কর্ণাটকে কংগ্রেসের মিছিলে পাকিস্তানী পতাকা।

হারের চুলচেরা বিশ্লেষণ করে আগামীতে পদক্ষেপ নেবেন।

বহু বছর থেকে দেখা গেছে দক্ষিণের এই রাজ্যে কোনও দলই পরপর দু'বার সরকার গড়তে পারেনি। এবারে সেই নিয়মেই বিজেপি হেরেছে বলে মনে হয়। আবার বিজেপির স্থানীয় নেতারা হয়তো ধরেই নিয়েছিলেন, যেহেতু নরেন্দ্র মোদীর মতো নেতা আছেন সেহেতু বিজেপি জিতে যাবে। তাই তারা জনগণের মনোভাব বোঝার চেষ্টা করেননি। তাদের এই গাছাড়া মনোভাব হারের কারণ হতে পারে বা আরও অন্য অনেক কারণ হতে পারে।

এতদিন দেখা গেছে একমাত্র পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া ভারতের আর কোনো রাজ্যে ভোটের আগে-পরে রক্তপাত তো দূরের কথা ধাক্কাধাক্কির কথাও শোনা যায়নি। কিন্তু এবারে কর্ণাটকে কংগ্রেস জেতার পর কয়েক জায়গায় বিরোধীদের ওপর হামলা এবং ঘরবাড়ি ভাঙচুরের খবর পাওয়া গেছে। এছাড়া একটি সংবাদপত্র লিখেছে— 'বিধানসভা ভোটের বিজয়োৎসবের সময় কংগ্রেস সমর্থকরা স্থানীয় বিজেপি কর্মী কৃষ্ণাপ্পার বাড়ির সামনে বাজি ফাটাচ্ছিল। তখন তিনি তার প্রতিবাদ জানান। তার জেরে বচসার সূত্রপাত। এরপরে দুপক্ষের কর্মী-সমর্থকরা সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। কৃষ্ণাপ্পার স্ত্রী এবং ছেলের ওপরও হামলা হয়। কংগ্রেস কর্মী সমর্থকরা ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা চালালে গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে সোমবার কৃষ্ণাপ্পার মৃত্যু হয়।'

এ যেন পশ্চিমবঙ্গের ছায়া কর্ণাটকে পড়েছে। পশ্চিমবঙ্গে যেমন একুশের ভোট পরবর্তী তালিবানি হিংসা দেখে রাজ্য, দেশ এবং বিশ্বজুড়ে তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে মানুষ সোচ্চার হয়েছিল তেমনি কর্ণাটকেও ভোটের পর কংগ্রেসি সমাজবিরোধীরা বিজেপি কর্মীদের হত্যা করা শুরু করেছে। আবার পশ্চিমবঙ্গে যেমন ভাতা অর্থাৎ' বিনাশ্রমে পাইয়ে দেবার রাজনীতি রয়েছে তেমনি কর্ণাটকেও কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহারে ভাতার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। যেমন প্রতি পরিবারের মহিলাদের মাসে ২০০০ টাকা করে, বেকার যুবক-যুবতীদের মধ্যে যাদের ডিপ্লোমা আছে তাদের মাসে দেওয়া হবে ১৫০০ টাকা, স্নাতক বা তার ঊর্ধ্বে যারা তাদের ৩০০০ টাকা করে। এছাড়া সরকারি বাসে মহিলারা বিনামূল্যে যাতায়াত করতে পারবেন এবং প্রতি পরিবারকে ২০০ ইউনিট করে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ দেবে সরকার। এজন্য কোষাগারের বাড়তি ৬২,০০০ কোটি টাকা খরচ হবে। আরও জানা গেছে, কর্ণাটকের প্রায় ৫.৬ লক্ষ কোটি টাকা এর সঙ্গে যোগ হতে পারে। এ যেন পশ্চিমবঙ্গের অনুপ্রেরণায় কর্ণাটক অনুপ্রাণিত হচ্ছে।

তাই আমরা মহামতি গোখলের সেই পুরনো কথা এখন অবশ্যই স্মরণ করে বলতে পারি যা তিনি বহু বছর আগে বলে গিয়েছেনে— 'হোয়াট বেঙ্গল থিংকস্ টুডে, ইন্ডিয়া থিংকস্ টুমরো'।

কর্ণাটকে কংগ্রেস অপ্রত্যাশিত জয় পাওয়ার পর সেখানকার মুসলমান সমাজ দাবি করেছে— 'কংগ্রেসের জয়ে মুসলমানদের বিশেষ অবদান রয়েছে। তাই তাদের যোগ্য প্রতিদান দিতে হবে। জয়ী মুসলমান প্রার্থী থেকেই উপমুখ্যমন্ত্রী-সহ ছয়জন মন্ত্রী করতে হবে।' সুন্নি ওয়াকফ বোর্ডের দাবি— 'কর্ণাটকে জয়ী মুসলমান বিধায়কদের মধ্যে থেকেই উপমুখ্যমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র, রাজস্ব, শিক্ষা, স্বাস্থ্য-সহ গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের মন্ত্রী করা হোক।' সুন্নি ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান সফি সাদির বক্তব্য— 'কর্ণাটকে কোনো জয়ী মুসলমান প্রার্থীকেই উপমুখ্যমন্ত্রী করা হোক। মুসলমানদের জন্যই কংগ্রেস রাজ্যে জয়লাভ করেছে। আমরা মুসলমানরা কংগ্রেসকে অনেককিছু দিয়েছি। এবার সময় এসেছে, তার বদলে কিছু পাওয়ার। মুসলমানদের প্রতিদান দেওয়া কংগ্রেসের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে।'

কংগ্রেসের বিপুল জয়ের পর সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখা গেছে সেখানে পাকিস্তানের পতাকা উড়ছে, পাকিস্তান জিন্দাবাদ, নারায়ে তাকদির, আল্লাহু আকবর ধ্বনি উঠছে। কাজেই কর্ণাটকের মতো ভারতের প্রতিটি রাজ্যে পাকিস্তানপ্রেমীরা বেশ সঙ্ঘবদ্ধভাবেই ঘাপটি মেরে রয়েছে এবং প্রতিটি বিজেপি বিরোধী দল তাদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ। সুযোগ পেলেই তারা তাদের দাঁত-নখ বের করে হিন্দুদের ওপর আক্রমণ করতে দ্বিধা করবে না বলেই অনেকে মত প্রকাশ করছেন। তার প্রমাণ পশ্চিমবঙ্গে একুশের ভোটের আগে পরে আমরা পেয়েছি। তেমনি কর্ণাটকেও কংগ্রেসের দুধেল গোরুরাও ইতিমধ্যে দাঁত-নখে ধার দেওয়া শুরু করেছে।

সমগ্র দেশে বিজেপিকে আরও বেশি করে কাজ করতে হবে। যেমন কর্মসংস্থান আর সরকারি চাকরি— এই শব্দ দুটির মধ্যে অনেক প্রভেদ রয়েছে। কর্মসংস্থান লোকের নজর কাড়ে না কিন্তু সরকারি চাকরি লোকের নজর কাড়ে। নয় বছরে কেন্দ্র সরকার নজর কাড়ার মতো একলপ্তে বিপুল সংখ্যক চাকরির ব্যবস্থা করতে পারেনি। যার জন্য যুবসমাজ আশাহত। অথচ প্রতি বছর, প্রতিমাস, প্রতিদিন কেন্দ্রের বিভিন্ন দপ্তরে কিছু কিছু কর্মী অবসর নিচ্ছেন। রেল, বিমান, সড়ক, ব্যাংক পর্যটন, পোস্ট অফিস-সহ আরও বহু কেন্দ্রীয় দপ্তর বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে রয়েছে যেখানে বিপুল সংখ্যক নিয়োগ হতে পারে। পেটের ভাতের নিশ্চয়তা থাকলে তবেই না ভোট দেওয়া নিয়ে চিন্তাভাবনা আসবে, কাকে ভোট দেওয়া উচিত। আর চাকরি নেই এই জন্যেই বেকাররা ভাতাজীবী হয়ে ভোট দিচ্ছে। সবকিছুর আগে সরকারকে বেকার যুবসমাজ সম্পর্কে ভাবতে হবে। কেননা এরাই দেশের ভবিষ্যৎ এরাই দেশের সম্পদ।

কেন্দ্রে বিরোধী দল হিসেবে থাকার সময় বিজেপির দাবি ছিল রামমন্দির নির্মাণ, কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা প্রত্যাহার, তিন তালাক বাতিল, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রয়োগ প্রভৃতির মধ্যে প্রথম তিনটির দাবি পুরণ করেছে বিজেপি। কিন্তু পরের গুলিও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যেভাবে বিভিন্ন রাজ্যে বিজেপির পরাজয় হচ্ছে তাতে আগামীদিনে লোকসভা নির্বাচন অত্যন্ত কঠিন হবে বিজেপির পক্ষে এবং রাজ্যে রাজ্যে হারের জন্য রাজ্যসভার সদস্য সংখ্যাও কমে যাবে। তাতে লোকসভায় বিল পাশ হলেও রাজ্যসভায় বিল আটকে যাবে। ফল হবে শূন্য। সুতরাং হিংস্র জন্তুদের হাত থেকে নিজ পরিবারকে রক্ষার জন্য যত কঠিন সিদ্ধান্তই হোক না কেন কেন্দ্র সরকারকে তা নিতে হবে। □

এখন অপেক্ষা 'বেঙ্গল ট্রুথ' দেখার

শিতাংশু গুহ

বড়ো পর্দায় 'দি কেরালা স্টোরি' দেখার পর আমার মনে হয়েছে, এতে নতুন কী আছে। সব ঘটনা সবার জানা। 'লাভ-জিহাদ' বা আইসিস-এর নৃশংসতা 'ওপেন সিক্রেট'। একশো শতাংশ সত্য। ম্যুভির নির্মাতারা একটু বড়ো পরিসরে প্রকাশ করেছেন মাত্র। তাঁরা বলেছেন, সত্য ঘটনা অবলম্বনে ছবিটি নির্মিত, যাঁদের নিয়ে এই ছবি তাঁদের বর্তমান অবস্থানও জানিয়েছেন। সংখ্যা নিয়ে বিতর্ক থাকতেই পারে, তবে ঘটনা 'হাসিয়া উড়াইয়া' দেওয়ার মতো কোনো কারণ নেই। হলে বসে ছবিটি দেখতে দেখতে আমার শুধু বাংলাদেশে 'ফাঁদে পড়ে' ধর্মান্তরিত হতভাগ্য হিন্দু মেয়েদের কথা মনে হচ্ছিল।

'দি কেরালা স্টোরি'-কে অনেকেই অতিরঞ্জিত বলছেন। কেউ কেউ 'ইসলামোফোবিয়া' বলবেন। কিন্তু হিজাবি নায়িকার কথাগুলো আমরা বা বাংলাদেশের হিন্দুরা কি প্রতিনিয়ত শুনছি না? ওয়াজে হুজুররা তো এসব কথা বলেই চলেছেন। বাংলাদেশে যে হাজারো নাবালিকা হিন্দু মেয়ে জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত হচ্ছে, কেরালা স্টোরির কাহিনি কি এর সঙ্গে মিলে যায় না? গ্রাম্য চক্রান্ত, মাতব্বর-হুজুরের ভূমিকা কি খুবই ভিন্ন? মেয়েদের প্রেগন্যান্ট করে ধর্মান্তর ও বিয়ের ঘটনা বাংলাদেশ বা ভারতে অজস্র। কেরালা স্টোরিতে লাভ-জিহাদ ও ধর্মান্তরকরণ প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের সঙ্গে মিল আছে, আইসিস অংশে মিল নেই। অনেকেই হয়তো আমার সঙ্গে একমত হবেন না। প্রয়োজনও নেই। তবু তাঁদের জন্যে বলছি, বাংলাদেশের বিনোদন জগতে 'পূর্ণিমা সেন থেকে অপু বিশ্বাস পর্যন্ত সকল নায়িকাকে ধর্মান্তরিত হতে হয়েছিল' এবং এটি অশিক্ষিতরা করেনি, সমাজের উচ্চস্তরের মানুষরা করেছে। বাস্তবতা হচ্ছে, আজকে বাংলাদেশে হিন্দু মেয়ের মা-বাবা 'লাভ-জিহাদ' নামক এক আতঙ্কের মধ্যে বসবাস করেন। কারণ তাঁরা জানেন, কিছু ঘটে গেলে কেউ এগিয়ে আসবেন না! এ কারণে এ মুভি সবার দেখা উচিত। আশা করি, কেরালা স্টোরি কিছুটা হলেও সামাজিক সচেতনতা আনবে, অনেক মেয়ে রক্ষা পাবে।

কেরালা রাজ্যকে ইসলামি রাজ্যে পরিণত করার পরিকল্পনা অশ্রুতপূর্ব কোনো ঘটনা নয়। পশ্চিমবঙ্গের জন্যেও একই কথা প্রযোজ্য। এটি একটি চলমান পরিকল্পিত প্রক্রিয়া। এজন্যে বিরাট অর্থ ব্যয় হয়। মেয়েদের ধর্মান্তরণ এর একটি ক্ষুদ্র অংশ। এজন্যে মুসলমান দেশগুলোতে 'নও মুসলমান' ফান্ড থাকে। কেরালা স্টোরিতে কেরালাতে ইসলামীকরণের চক্রান্ত তুলে ধরা হয়েছে। বাংলাদেশে পার্বত্য চট্টগ্রামে অর্ধ-শতাব্দীতে জনজাতিরা ৯৮ শতাংশ থেকে সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছেন। আরও কিছুটা সময় পর হয়তো তাঁরা হারিয়ে যাবেন। এ কাজটি সকল সরকার, প্রগতিশীল- প্রতিক্রিয়াশীল সবাই মিলেই করছে।

মুভি হিসেবে 'দি কেরালা স্টোরি' দর্শক ধরে রাখতে সক্ষম। এটি দেখতে দেখতে আমার বাংলাদেশের কথাই বারবার মনে হয়েছে। কাশ্মীর ফাইলস দেখার পর আমার মনে হয়েছিল, ভারতীয়রা এতটা নির্বোধ ক্যামনে হয়? এখন অপেক্ষায় আছি 'বেঙ্গল ট্রুথ' দেখার। কারণ দুই বঙ্গের ঘটনা কাশ্মীর বা কেরালা থেকে অনেক ভয়াবহ। বাঙ্গলার হিন্দুরা ১৯০৫ থেকে অত্যাচারিত হয়ে আসছে। ১৯৪৬-এর ডাইরেক্ট অ্যাকশান, নোওয়াখালি গণহত্যা, বরিশাল, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জে হিন্দু হত্যা বা ১৯৭১-এ হিন্দুদের টার্গেট করে হত্যা। গত ৫২ বছরের হিন্দু নির্যাতনের ঘটনা মানুষের জানার অধিকার আছে। মুভিটি দেখতে দেখতে ভাবছিলাম, বাংলাদেশের নাবালিকা হিন্দু মেয়ে ধর্মান্তরণের সঙ্গে কেরালা বা পশ্চিমবঙ্গ বা পুরো ভারত অথবা ইউরোপ-আমেরিকা সর্বত্র বিধর্মী মেয়েদের ধর্মান্তরণের কি কোনো তফাত আছে? চিন্তা, মনন তো একই, প্রক্রিয়া হয়তো ভিন্ন। লাভ জিহাদ সত্য, এনিয়ে কারো সংশয় থাকার কথা নয়! 'দি কেরালা স্টোরি' মূলত লাভ-জিহাদ এবং আইসিস সংক্রান্ত। ঘটনা জমজমাট। আইসিস, আল-কায়দা বা ইত্যাকার ইসলামি সন্ত্রাসী সংগঠনের অত্যাচারের বীভৎসতা মানুষ জানে। এ ধরনের আরও মুভি হোক। মানুষ জানুক। নতুন প্রজন্ম ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিক, ধর্মের নামে অধর্ম বন্ধ হোক।

> **মমতা ব্যানার্জি, মহুয়া মৈত্র বা স্বরা ভাস্বররা এই মুভি নিষিদ্ধের পক্ষে থাকবেন এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কতকাল সত্যকে মিথ্যা দিয়ে ঢেকে রাখা যাবে?**

সত্য ঘটনা অবলম্বনে তৈরি এ মুভি দর্শক মনোরঞ্জনের কারণে হয়তো কিছুটা অতিরঞ্জিত, যা সিনেমায় সচরাচর ঘটে থাকে, কিন্তু কেরালার ইসলামীকরণ এবং সেই লক্ষ্যে লাভ-জিহাদ নির্ভেজাল সত্য। এই ঘটনা পশ্চিমবঙ্গের জন্যেও সত্য। বাংলাদেশের জন্যেও সত্য। পুরো পৃথিবীর জন্যেও সত্য। কেরালার সব মেয়ে লাভ-জিহাদের শিকার তা নয়, লোভ-লালসা, যৌনতা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা সবই আছে, কিন্তু হিন্দুমেয়ে মুসলমানে ধর্মান্তর করে বেহেশতে যাওয়া বা ভারত-সহ, পুরো বিশ্বকে ইসলামীকরণের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা তো মিথ্যা নয়! হুজররা তো এসব কথা প্রকাশ্যেই বলে বেড়াচ্ছেন।

মমতা ব্যানার্জি পশ্চিমবঙ্গে 'দি কেরালা স্টোরি' নিষিদ্ধ করেছিলেন। এজন্যে মমতা ব্যানার্জিকে সাম্প্রদায়িক ভাবার কোনো কারণ নেই, তিনি 'ফারুক আবদুল্লাহর' মতোই মহান অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তিত্ব। মমতা মুভিটি নিষিদ্ধ করেছেন তাঁর ভোটব্যাংক 'দুধেল গাই'-দের সন্তুষ্ট রাখতে। ভারতবর্ষের প্রগতিশীলরা কাশ্মীর থেকে পণ্ডিতদের খেদিয়ে দিলে, কেরালা ইসলামি রাজ্য হলে, বাংলাদেশ থেকে হিন্দুরা বিতাড়িত হলে কিছু মনে করেন না। কারণ তাঁদের পূর্ব-পুরুষরা মুঘলদের দাসত্ব করে এসেছেন, তারাও তাই করছেন! মমতা ব্যানার্জি, মহুয়া মৈত্র বা স্বরা ভাস্বররা এই মুভি নিষিদ্ধের পক্ষে থাকবেন এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কতকাল সত্যকে মিথ্যা দিয়ে ঢেকে রাখা যাবে? সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে 'দি কেরালা স্টোরি' পশ্চিমবঙ্গে আবার ছাড়পত্র পেয়েছে। □

ঐতিহাসিক কোহিনুর হিরা দেশে ফেরাতে উদ্যোগী মোদী-সরকার

কোহিনুর হিরা ফিরবে ভারতে? সূত্রের খবর, দেশে কোহিনুর হিরা ফেরাতে এবার বদ্ধপরিকর নয়াদিল্লি। আপাতত মোদী সরকারের কূটনীতির দিকেই তাকিয়ে রয়েছে গোটা দেশ। খুব দ্রুত এনিয়ে কূটনৈতিক স্তরে আলাপ-আলোচনা শুরু করবে ও পদক্ষেপ নেবে ভারত। এই কূটনৈতিক প্রকল্পের নাম দেওয়া হয়েছে 'রেকনিং উইথ দ্য পাস্ট'। কূটনীতিকরা মনে করছেন, কোহিনুর হিরা ভারতে ফিরলে তা যে কেবল দেশের কূটনৈতিক শক্তিরই জয় হবে, এমনটা নয়। সেইসঙ্গে দেশের ইতিহাসের প্রতিও সুবিচার করা হবে, বাকি বিশ্বের কাছে ভারতের সম্মান বাড়বে। সবচেয়ে বড়ো কথা, বিশ্বের সামনে প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য সামনে আসবে। ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ উইলিয়াম ডালরিম্পল ও অনীতা আনন্দ তাদের রচিত 'কোহিনুর : দ্য স্টোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ডস মোস্ট ইনফেমাস ডায়মন্ড' নামের বইটিতে কোহিনুর নিয়ে প্রচলিত মিথগুলি সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। কোহিনুর হিরা নিয়ে দীর্ঘদিনের বিতর্ক আরও বাড়িয়েছে এই প্রচলিত মিথগুলি। ইতিহাসের এই গল্পগাছা থেকে যেটুকু প্রামাণিক ইতিহাস এখনো পর্যন্ত জোগাড় করা গিয়েছে তার নিরিখে বলা যায়, ঔপনিবেশিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে ১৮৫০ সাল নাগাদ ভারতের এই বহুমূল্য সম্পদ চলে যায় ব্রিটেনে। ১০৮.৯৩ ক্যারেট ওজনের এই হিরাটি ব্রিটেনের মহারানি কুইন প্রথম ভিক্টোরিয়া তাঁর হাতে অলংকার (ব্রোচ) হিসাবে ব্যবহার করতেন। পরে এই হিরাটি টাওয়ার অব লন্ডনে আসে এবং ব্রিটেনের ক্রাউন জুয়েলারির অঙ্গ হিসেবে গণ্য হয়। কোহিনুর হিরা বহু বছর ধরে ব্রিটিশ রানির মুকুটে শোভাবর্ধন করছে।

গত ৬ মে ইংল্যান্ডের চল্লিশতম রাজা হিসেবে তৃতীয় চার্লস শপথ গ্রহণ করেন। তার কিছুদিন আগেই নজিরবিহীন ভাবে ব্রিটেনের রাজপরিবার থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়, ওই শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে ব্রিটিশ-রানির মুকুটে কোহিনুর হিরা থাকছে না। হঠাৎ কেন এই ঘোষণা? তথ্যাভিজ্ঞমহল মনে করছেন, বিশেষ এই হিরাটির সঙ্গে বিভিন্ন রাজবংশের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিরোধ ও সেই কারণে অভিশাপ ও ধ্বংসের ইতিহাস জড়িয়ে আছে। তাই কোহিনুর হিরাকে অভিশপ্ত বলে মনে করা হয়।

ইতিহাসও এই অনুমানের স্বপক্ষে তথ্য দেয়। যেমন ব্রিটিশ রাজপরিবার এই হিরাটির মালিকানা প্রাপ্তির পর রানি ভিক্টোরিয়া একটি আইন জারির মাধ্যমে ঘোষণা করেছিলেন যে পরিবারের পুরুষেরা অর্থাৎ রাজারা নয়, শুধুমাত্র রাজপরিবারের মহিলারা অর্থাৎ রানিরাই কোহিনুর হিরা তাদের মুকুটে ব্যবহার করতে পারবেন। কারণ ব্রিটিশদের হাতে আসার পূর্বে এই হিরাটির সকল মালিকরাই ছিল পুরুষ, তথাকথিত অভিশাপের শিকার তারাই হয়েছিল বলে মনে করা হয়। তৃতীয় চার্লসের রাজ্যাভিষেকের সময় তাই এই হিরা ব্যবহারের আর ঝুঁকি নিতে চায়নি বাকিংহাম প্যালেস। তবে ব্রিটিশ রাজপরিবারের আচমকা এই ঘোষণার পেছনে কূটনীতির ছায়াও দেখছেন কেউ কেউ। ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতার সময় এবং তারপর ১৯৫৩ সালে রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের রাজ্যাভিষেকের সময় কোহিনুর হিরা ফেরতের দাবি তুলেছিল ভারত। ভারতের এই দাবির পেছনে ঐতিহাসিক যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল।

কোহিনুর হিরা ঘিরে নানারকম মিথ প্রচলিত থাকলেও তার মধ্যে থেকে ইতিহাসের যেটুকু খোঁজ মেলে তাতে জানা হয় খ্রিস্টীয় যোড়শ শতাব্দীতে মালওয়ার রাজাদের অধিকারে থাকা এই কোহিনুর হিরে দখল করে মুঘলরা। একসময় মুঘল বাদশা শাহজাহানের ময়ূর সিংহাসনের শোভাবর্ধন করেছিল এই কোহিনুর হিরা। ভারতবর্ষের শাসক হিসেবে মুঘলদের অবস্থা খারাপ হলে মুঘল শাসকরা ভারতে মুসলমান শাসন জারি রাখার উদ্দেশ্যে ইরানের শাসক নাদির শাহের দ্বারস্থ হন। কিন্তু নাদির শাহের সাহায্যের বিনিময়ে তাঁকে প্রতিশ্রুত অর্থ দিতে না পারায় সে এই ঐতিহাসিক হিরাটি ইরানে নিয়ে চলে যায়। নাদির শাহ নিহত হওয়ার পর এটির মালিকানা পান আফগান শাসকেরা। এরপর পঞ্জাবের মহারাজা রঞ্জিৎ সিংহ তাদের কাছ থেকে কোহিনুর হিরা উদ্ধার করেন এবং তিনি উইল করে তা পুরীর জগন্নাথ মন্দিরকে দিয়ে যান। উনিশ শতকের মাঝামাঝি ব্রিটিশ-শিখ যুদ্ধের পর ব্রিটিশরা শিখ সাম্রাজ্য দখল করে এবং ডালহৌসির সঙ্গে শিখদের যে চুক্তি সম্পন্ন হয়, তাতে কোহিনুর হিরা সমেত পঞ্জাবের মহারাজার যাবতীয় সম্পদ ইংল্যান্ডের মহারানি ভিক্টোরিয়াকে প্রত্যার্পণের কথা বলা হয়। শিখদের পক্ষে মহারাজা দলীপ সিংহ এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। ভারত সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন তুলেছে, শিখদের পক্ষে নাবালক দলীপ সিংহ, যাঁর মাকে অসহায় অবস্থায় বন্দি করে একপ্রকার জোরপর্বক তাঁকে চুক্তিতে সই করতে বাধ্য করা হয়েছে, এই চুক্তির অজুহাত দেওয়া কতটা যুক্তিযুক্ত?

পরবর্তীকালে আটের দশকে এনিয়ে ঐতিহাসিক অপব্যাখ্যা করে ইরান, পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও বাংলাদেশ কোহিনুর হিরার মালিকানা দাবি করে। আসলে ব্রিটেনে রাজপরিবারে থাকা ক্রাউন জুয়েলারির আটাশশোটি বহুমূল্য রত্নের মধ্যে কোহিনুর হিরার স্থান অতি উচ্চে। তাই এই চোরাই সম্পত্তি যেমন ব্রিটিশরা হাতছাড়া করতে চাইছে না, তেমনি একদা ভারতের অংশ হওয়ার সুবাদে ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলিও সুযোগ বুঝে এর মালিকানা দাবি করছে। কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে এর একমাত্র দাবিদার ভারতের কাছে কোহিনুর হিরা আবার ফিরে আসে কিনা নয়াদিল্লির কূটনীতির দিকে সে ব্যাপারে অধীর আগ্রহে তাকিয়ে সারা দেশ। □

ত্র্যম্বকেশ্বর মন্দিরে ল্যান্ড জিহাদের চেষ্টা ব্যর্থ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ আর একটা ল্যান্ড জিহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। ইসলামিক জিহাদিদের একটা দল মহারাষ্ট্রের ত্র্যম্বকেশ্বর মন্দিরে ঢুকেছিল শিবলিঙ্গের ওপর চাদর চড়াতে। নিরাপত্তা রক্ষীরা এবং মন্দির কর্তৃপক্ষ সতর্ক থাকায় তাদের এই জোর করে মন্দিরে ঢোকার চেষ্টা সফল হয়নি। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যাওয়া বেশ কয়েকটি ভিডিয়ো ক্লিপিংস থেকে ঘটনাটি প্রকাশ্যে এসেছে। দেখা গেছে কয়েকজন জিহাদি একেবারে দরগার স্টাইলে জ্যোতির্লিঙ্গ মন্দিরে চাদর চড়াবার জন্য মন্দিরের ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছে। নিরাপত্তা রক্ষীরা তাদের আটকে দেয়। একটি ভিডিয়ো ক্লিপে দেখা যাচ্ছে ৫/৬ জনকে, তাদের হাতে সবুজ চাদর। তারা মন্দির প্রাঙ্গণে ঢুকতে না পারলেও, এই ঘটনায় সাধারণ মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। শেষপর্যন্ত মন্দির কর্তৃপক্ষ, নিরাপত্তা রক্ষী ও পুলিশের সম্মিলিত প্রয়াসে স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরে আসে। মহারাষ্ট্র সরকার সময় নষ্ট না করে ঘটনার তদন্তে নেমে পড়েছে। রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীশ সিট গঠন করার নির্দেশ দিয়েছেন। এই বিশেষ তদন্তকারী দলে অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর জেনারেল অব পুলিশ পদমর্যাদার অফিসাররা আছেন। তদন্ত শেষ হলে জানা যাবে ঘটনার প্রকৃত কারণ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত বছরও একদল যুবক জোর করে মন্দিরে ঢোকার চেষ্টা করেছিল। তদন্তকারী দল গত বছরের ঘটনারও তদন্ত করবে।

মেদিনীপুরে সাফল্য : মাধ্যমিকে প্রথম দশে চার

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ এবারের মাধ্যমিকের ফল বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে মেদিনীপুর শহর সংলগ্ন যমুনাবালি (বিদ্যাভারতী পরিচালিত) সারদা বিদ্যামন্দিরে ছাত্রদের মধ্যে আনন্দের জোয়ার দেখা যায়। রাজ্যে প্রথম দশজনের মেধা তালিকায় একজন পঞ্চম, দুজন সপ্তম ও একজন দশম স্থান অর্জন করেছে। ছাত্র, আচার্য-আচার্যা ও অভিভাবকদের মধ্যেও আনন্দের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। গত দশ বছর যাবৎ বিদ্যামন্দির সরকারি অনুমোদন পাওয়ার পর থেকেই শিক্ষার্থীরা ভালো ফল করছিল, কিন্তু এবারে তা নজর কাড়ার মতো। ফল জানার এক ঘণ্টার মধ্যে জেলা স্কুল পরিদর্শক, সহকারি পরিদর্শক বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়ে ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সফল ছাত্র ও তার পিতা-মাতাদের অভিনন্দন জানান। চারজন কৃতী ছাত্রের নাম হলো : সুপ্রভ আদক : পঞ্চম— ৬৮৮/৭০০। দেবশঙ্কর সাঁতরা : সপ্তম— ৬৮৬/৭০০। শিবেন্দু বেরা : সপ্তম—৬৮৬/৭০০। ময়ূখ পাত্র : দশম— ৬৮৩/৭০০।

এ বছর মাধ্যমিকে বীরভূম থেকে দু'জন মেধা তালিকায় স্থান পেয়েছে। সপ্তম স্থানে সরস্বতী শিশু মন্দিরের ছাত্রী সৌমি দে ৬৮৬ নম্বর পেয়ে সপ্তম স্থান অধিকার করেছে। দশম স্থানে সরকার অধিগৃহীত একটি স্কুলের ছাত্র। নব্বইয়ের দশকের শুরুতে বীরভূম জেলায় সিউড়িতে খুব ছোট্ট আকারে সরস্বতী শিশু মন্দির শুরু হয়েছিল। বীরভূমে মাত্র কয়েক বছরে আকারে প্রকারে সরস্বতী শিশু মন্দিরগুলি বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও ভারতীয় বা হিন্দু রীতি-নীতি এই সব স্কুলে অনুসরণ করা হয়। সব ধর্মের ছেলে-মেয়েরা বিনা আপত্তিতে এখানে পড়াশোনা করে।

।। চিত্রকথা ।। মহামানব মহানামব্রত ।। ৪৬ ।।

নিরাসক্ত কর্মযোগীর মতো এবার কাজ করে যেতে লাগলেন মহানামব্রতজী। শুরু হলো মঠ প্রতিষ্ঠার কাজ। চলতে লাগল লেখালেখি।

বাংলাদেশের ফরিদপুর শ্রীধাম শ্রীঅঙ্গনে শত শত ভক্তের সঙ্গে কীর্তনানন্দ উপভোগ করতেন মহানামব্রতজী।

(ক্রমশ)